KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১১৫ নং বেনিয়াপুকুর রোড, কল-৬৯
Collection : KLMLGK	Publisher : তরুণ চন্দ্র মিত্র
Title: চিত্ত	Size: 7.25" x 9.5" 18.41 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/2 2/3 3/1 3/2 3/3	Year of Publication : শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৫৫ কার্তিক - পৌষ, ১৩৫৭ বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৫৮ শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৫৮ কার্তিক - পৌষ, ১৩৫৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সুহৃদ চন্দ্র মিত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৬৬ প্রথম বর্ষ

চিত্ত

সম্পাদক— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি

সহ সম্পাদক— তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
সমীরকুমার বসু, এম.এ.

সম্পাদক পর্ষদ্— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহা, এম.বি.বি.এস.

সহযোগীবৃন্দ— শ্রীমতী অরুণা হালদার, এম.এ.
শ্রীমতী কনক মজুমদার, এম.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি.বি.এস., এম.আর.সি.পি., ডি.পি.এম.
অজিতকুমার দেব, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস., ডি.পি.এম্.
ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, এম্.এস্‌সি. এম.বি.বি.এস., ডি.ফিল.
দেবব্রত সিংহ, এম.এ., ডি.ফিল.
বিজয়কেতু বসু, বি.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
রমেশচন্দ্র দাস, এম.এস্‌সি., পিএইচ.ডি.
রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়
হিরন্ময় ঘোষাল

পরিচালক সমিতি—সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.
অজিতকুমার দেব, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস., ডি.পি.এম
ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস., ডি.ফিল
প্রমদানাথ চৌবে, এম.এ.

সূচীপত্র

১।	মনের বিজ্ঞান	দেবব্রত সিংহ	১
২।	ঝগড়াটে মন	—ধনপতি বাগ	৬
৩।	বৈজ্ঞানিক উপায়ে যোগ্যতা-নিরূপণের গুরুত্ব	—সুনীল চন্দ্র বিশী	১১
৪।	অপরাধ-সামাজিক ব্যাধি	—বিমল মুখোপাধ্যায়	১৪
৫।	রোগযন্ত্রণার মনস্তত্ত্ব	—হরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮
৬।	শিশুর প্রশ্ন	—তরুণচন্দ্র সিংহ	২০
৭।	অরুণোদয়	—অনাদিনাথ ঘোষাল	২৫
৮।	নাম মনে করতে না পারার কারণ	—সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (অনুবাদ : বিজয়কেতু বসু)	৩১
৯।	চিত্তভ্রংশী ভ্রমবাতুলতা	—শ্রীমতী কনক মজুমদার	৩৫
১০।	মানসিক রোগীর সমস্যা	—মিলনমোহন মজুমদার	৩৮
১১।	পুস্তক সমালোচনা		৪০
১২।	সার সংকলন		৪২
১৩।	লুম্বিনি সম্বন্ধে		৪৩

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খবর লইয়া জবাব সহ জানাইতে হইবে।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি প্রকাশসংক্রান্ত মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা) টাকা—প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

চিত্ত

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৬৬

মনের বিজ্ঞান

দেবব্রত সিংহ, ডি.ফিল.*

আর দশটা প্রাকৃত বিষয়ের মতো মনকে নিয়েও রীতিবদ্ধ বিজ্ঞান সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন উঠতে পারে। অর্থাৎ, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি প্রাকৃতবিজ্ঞানে তথ্যের ভিত্তিতে যেমন রীতিবদ্ধ ব্যাখ্যান করা হয়, তথাকথিত মানসতথ্যেরও তেমনি ব্যাখ্যান সম্ভব কিনা? এটা যে সম্ভব, মনোবিদ্যা-নামক স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রের অস্তিত্বই তার সহজ প্রমাণ। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও মনোবিদ্যার স্বতন্ত্র প্রাকৃতবিজ্ঞান হিসাবে অস্তিত্ব এমন স্বীকৃতি পায় নি; বরং তার বৈজ্ঞানিক মূল্য নিয়ে দাঁড়াবার অধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। আজকের দিনে এ পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। আজ আর মনোবিদ্যার বিজ্ঞানগত সত্তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না। অন্যান্য প্রাকৃতবিজ্ঞানের মতোই এতে প্রাকৃত প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্যের নিরূপণ হচ্ছে, সামান্যীকরণ হচ্ছে, প্রকল্প (hypothesis) রচিত হচ্ছে এবং প্রাকৃতনিয়ম আবিষ্কৃত হচ্ছে। তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, পুর্বপ্রচলিত প্রাকৃতবিজ্ঞানগুলির মর্যাদায় মনোবিদ্যা এখনও উন্নীত হয় নি। মনোবিদ্যা এখনও বহুলাংশে প্রকল্পের পর্যায়ে রয়েছে, বহু তথ্য এখনও অনির্ণীত রয়েছে, বহু প্রত্যয় এখনও সুনির্দিষ্ট হতে বাকী আছে। এমন কি এ-সন্দেহও কখনও কখনও উঁকি দেয় যে, আদৌ মনোবিদ্যা পুরাপুরি প্রাকৃতবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে কিনা। তাই আমাদের এই মূল প্রশ্নের অবতারণা: মনের সঠিক বিজ্ঞান সম্ভব কিনা? এবং সম্ভব হলে তা কি ভাবে সম্ভব? আর এই প্রশ্নের সমাধানের উপর নির্ভর করবে শেষ-পর্যন্ত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা-নির্দেশ।

প্রথমেই প্রাকৃতবিজ্ঞানের সাধারণ লক্ষণটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটাই এ প্রসঙ্গে বড় প্রশ্ন। প্রাকৃত-তথ্যের ভিত্তিতেই যে-কোনও বিজ্ঞান গড়ে ওঠে; কিন্তু সে তথ্য বা উপাত্ত (data) যে-কোনও ভাবে আহরণ করলে চলবে না। প্রাকৃত ঘটনা এবং বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণই এর একমাত্র উপায়, অর্থাৎ সত্য-নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যক্ষীকরণ। আর উদ্দেশ্য কি? সমজাতীয় তথ্যরাশির অন্তর্নিহিত নিয়মকে আবিষ্কার করা। এই উদ্দেশ্যে

* বারাসত সরকারী মহাবিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের সহ-অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের উপাধ্যায়।

প্রকল্পের সৃষ্টি, এবং এই প্রকল্পকে আবার বাস্তব তথ্যের উল্লেখে পরীক্ষিত সত্যের পর্যায়ে উন্নয়ন। এই যদি মোটামুটি প্রাকৃতবিজ্ঞানের পদ্ধতি হয়, মনের অথবা মানস-ব্যাপার ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কি ভাবে সম্ভব ?

প্রশ্নটি প্রধানতঃ মানস-ব্যাপারের ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে। রীতিবদ্ধ পর্যবেক্ষণের মারফৎ তথ্য-সংগ্রহ, ভৌতিক (physical) তথ্যগুলির তুলনায় অভৌতিক ব'লে স্বীকৃত মানস-ব্যাপারের ক্ষেত্রে আপাত-দৃষ্টিতে দুরূহ ব'লে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ, অন্যান্য প্রাকৃতবিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটনা স্বভাবতঃ বহির্জগতের অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই গ্রহণ করা হয়, এবং তার পর্যবেক্ষণও তাই বিষয়গত (objective)। আর এই বিষয়গত প্রতিজ্ঞাসই (attitude) তো আমাদের প্রকৃতিগত। আমাদের মন স্বভাবতই বাইরের দিকে অর্থাৎ রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় যে জগৎ—যার মধ্যে দেহও অন্তর্ভুক্ত—তার দিকে প্রবৃত্ত হয়। অথচ মনকে বা মনের ব্যাপারকে পর্যবেক্ষণ করার অর্থ এই স্বাভাবিক গতিটিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে ফেরানোর চেষ্টা করা। এটা যে নেহাৎ অপচেষ্টা নয় তার সাক্ষ্য দিচ্ছে আমাদের মনেরই অপর একটি প্রতিজ্ঞাস যা মনকে বহির্মুখী করার সঙ্গে সঙ্গে আবার কখনও কখনও অন্তর্মুখীও ক'রে তোলে। অর্থাৎ আমরা যখন আত্মসচেতন হই ব'লে বলি, তখন আমাদের মনের বর্তমান অবস্থাটাই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। আর মনোবিৎরা এই সত্যটিকেই মেনে নিয়ে একে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের স্তরে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একেই বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্দর্শন (introspection)।

অন্তর্দৃষ্টিমূলক পর্যবেক্ষণের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এখানে আমাদের অনুভবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত উভয় দিক্‌কে তেমন স্পষ্ট ক'রে পৃথক্ করা যায় না, যেমন বিষয়গত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সম্ভব। অন্য ক্ষেত্রে বিষয়ীর অনুভব এবং তার উপলক্ষ্য যে বিষয়, উভয়ের মধ্যে একটা ভেদ নির্ণয় করা সহজেই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। অন্তর্দৃষ্টিতে কিন্তু অনুভব নিজেই পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে পড়ে; অনুভব করা এবং অনুভাবিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। তাই Wundt—যাঁকে আধুনিক মনোবিদ্যার প্রবর্তকরূপে গণ্য করা যায়—মনোবিদ্যার পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত অন্তর্দৃষ্টিকে অনুভব-প্রাপ্ত হওয়ায়ই সামিল ব'লে মেনেছেন। এই পাওয়া-অনুভব পর্যবেক্ষণ করারই সমান; মানস-ব্যাপারকে পাওয়া মানে তাকে পর্যবেক্ষণ করা। পরবর্তী মনোবিৎ Titchener-ও এই পদ্ধতিই মেনে নিয়েছেন; তবে তিনি এর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মূলে রয়েছে তিনটি ব্যাপার—নিজের অনুভবের প্রতি একটি বিশেষ ধরনের প্রতিজ্ঞাস, অনুভব করা এবং এই অনুভবের একটি যথাযথ বিবরণ। যেখানে মনোবিৎদের প্রতিজ্ঞাসের প্রশ্ন আসছে, সেখানে সমগ্র পর্যবেক্ষণ-প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি।

অবশ্য এই অন্তর্দৃষ্টি (বিশেষতঃ ইংরেজী introspection) কথাটির চলতি ব্যবহারের ফলে অপপ্রয়োগ খুব স্বাভাবিক। তাই Titchener এই চলতি ব্যবহার থেকে পৃথক্ করবার জন্য দেখিয়েছেন যে একে স্বকীয় অনুভব নিয়ে অনুচিন্তন বা অনুধ্যান কিংবা একটা অন্তস্থ ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা ব'লে ভুল করলে চলবে না। মানস-ব্যাপারগুলিকে তাদের মূলগত উপাদানে পর্যবসিত করাই অন্তর্দৃষ্টির লক্ষ্য; এবং এই মানস-উপাদান, Titchener-এর মতে, তিনটি শ্রেণীতে পড়ে—সংবেদন, প্রতিরূপ এবং অনুভূতি।

এখন অন্তর্দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি হিসাবে কতটা নির্ভরযোগ্য এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে এবং মনোবিদ্যার ইতিহাসে এ সন্দেহ গুরুতরভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিরূপে পর্যবেক্ষণের যে একরূপতা, যে ব্যক্তিনিরপেক্ষতা থাকা দরকার—এক কথায় বিষয়ানুগতা —তা কি এর আছে? কারণ, অন্তর্দৃষ্টি এক বিষয়ী থেকে অপর বিষয়ীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে বাধ্য, এর ধরাবাঁধা কোনও পথ নেই। তা ছাড়া এ পদ্ধতির

মধ্যে একটি আন্তর স্ববিরোধ রয়েছে—মন একই সাথে বিষয় এবং বিষয়ী হিসাবে অবস্থান করছে। এহীতা মন যুগপৎ আপন গ্রহণ-ক্রিয়ার গ্রাহ্য বিষয়ের ভূমিকা নিলে মনোযোগ দ্বিধাবিভক্ত তথা ব্যাহত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এও সত্যি কথা যে কোনও মানস-ব্যাপারের প্রতি সচেতনভাবে দৃষ্টি দিলে তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকেই ক্ষুণ্ন করা হবে।

এ ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের (introspectionist) বক্তব্য এই যে এই বিষয়ীগত পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত না হলেও তাকে বহুলাংশে সঠিক ও নির্ভর-যোগ্য করা যায়। অভ্যাস, পুনরাবৃত্তি, বহু বিষয়ীর বিবরণের পর্যালোচনা ও নির্ধারণের দ্বারা অন্তর্দৃষ্টিকে অনেকটা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে পরিণত করা যায়।

কিন্তু অপর পক্ষ তাতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা চান আর দশটা প্রাকৃতবিজ্ঞানের মতো মনোবিদ্যাকেও বিষয়গত পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ মানস-ব্যাপারকে বিষয়গতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কিন্তু মানস-ব্যাপারকে ঠিক কি বিষয়গত দৃষ্টিতে ধরা সম্ভব? অন্ততঃ প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, সে-ভাবে আর দশটা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। যা সম্ভব তা হচ্ছে ব্যক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা। এবং তার পিছনে ক্রিয়াশীল মানস-ব্যাপারগুলিকে অনুশীলন করা। সাধারণতঃ কোনও মানস-প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দেহের কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। তবু একটা কথা, এ ক্ষেত্রেও তো অন্তর্দৃষ্টিকে একেবারে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ ব্যবহারের প্রতিবেদী মানস-প্রক্রিয়াটির সঠিক নির্ধারণ অপেক্ষা করে অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিশ্লেষণের উপরেই। শেষ-পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিগত আবিষ্কারের নিরিখেই অপরের বাহ্যিক ব্যবহারের ব্যাখ্যান সম্ভব।

Titchener-এর অবয়ববাদী (structuralism) ব্যাখ্যানের পরে ক্রিয়াবাদী (functionalism) সম্প্রদায়ে তাই দেখতে পাই বিষয়ীগত ও বিষয়গত এই উভয় প্রকারের পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি আপোষ। বিষয়ীগত পর্যবেক্ষণ বা অন্তর্দৃষ্টি যেমন স্বীকার করা হয়েছে তেমনি স্বীকৃত হয়েছে বিষয়গত পর্যবেক্ষণ যার দ্বারা অপর ব্যক্তির ব্যবহারে প্রতিফলিত মানস-প্রক্রিয়ার অনুশীলন করা হয়।

কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিকে এই আংশিক স্থান দিতেও আধুনিক আর একদল মনোবিৎরা স্বীকৃত হন নি। অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যাখ্যান এবং বিষয়গত ব্যবহারাশ্রয়ী পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা প্রকট হয়েছে Watson প্রমুখ চেষ্টিত-বাদী (behaviourist) সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁদের মতে মনের তথাকথিত আদিম উপাদানগুলির বিশ্লেষণের যে দাবী অন্তর্দৃষ্টিমূলক মনোবিদ্যা ক'রে থাকে, তার ভিত্তিতে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য প্রাকৃতবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিভিন্ন উপায়ে বিষয়গত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনমত ও সম্ভবপর ক্ষেত্রে প্রয়োগ-পরীক্ষা (experiment) মনোবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংগ্রহের একমাত্র পথ।

সাধারণভাবে যাকে বিষয়গত পর্যবেক্ষণ বলা হচ্ছে, তার মধ্যে নানারকম বিশেষ প্রয়োগকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আধুনিক প্রায়োগিক মনোবিদ্যার (experimental psychology) মধ্যে এগুলির বহুল প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এর দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি চেষ্টিত-বাদী বলা চলে। বিষয়গত পর্যবেক্ষণের প্রয়োগকৌশল নানাভাবে অনুসৃত হচ্ছে—যেমন, (১) পরীক্ষাগত নিয়ন্ত্রণসহ এবং নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ, (২) সাপেক্ষ প্রতিবর্তক (conditioned reflex) পদ্ধতি, (৩) বাচিক বিবরণের (verbal report) পদ্ধতি এবং (৪) বিভিন্ন অভীক্ষণ (testing) পদ্ধতি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক মনোবিদ্যার গতি স্বভাবতই বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে। অনুভবের চেয়ে ব্যবহারের দিকেই যেন এর ঝোঁক। চৈতন্যের স্বরূপ ও গঠন, তার বিভিন্ন উপাদান এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্ন গৌন হয়ে গেছে। এমন কি অনুভবের যে বিভিন্ন পদার্থ—যেমন সংবেদন, প্রতিরূপ (image), অনুভূতি (feeling), প্রতিকৃতি (gestalt) এবং মানসিক ক্রিয়া—সেগুলি সব অনুমেয়ের পর্যায়ে পরিণত হয়েছে। ঠিক পর্যবেক্ষণযোগ্য বস্তু বলে গৃহীত হচ্ছে না। বিশেষতঃ পরীক্ষামূলক গবেষণার

ক্ষেত্রে এটা প্রতিভাত হচ্ছে যে, বিষয়ীর মন তার ব্যবহার থেকে অনুমিত হয়। এই সঙ্গে আছে অন্তর্দৃষ্টি-মূলক পদ্ধতির প্রত্যাখ্যান।

পদ্ধতিক্রমের এই বিবর্তনের পিছনে রয়েছে একটি মূল প্রশ্ন: তা হ'ল মন সম্বন্ধে ধারণা। মন পদার্থটি কি? এই প্রশ্নের মীমাংসার সাথে জড়িত আছে মনের ব্যাখ্যানে কী পদ্ধতি গ্রহণীয় সেই প্রশ্নের মীমাংসা। কারণ, মন যদি প্রাকৃত-ভৌতিক-জগতের বস্তুর মতো একটি বস্তু হয় তবে তার ব্যাখ্যানে অন্যান্য ভৌতিকবিদ্যার পদ্ধতিই গ্রহনীয়। কিন্তু সাধারণ ধারণা এবং পূর্বপ্রচলিত মত অনুসারে অন্ততঃ মনকে ভূতধর্মী ব'লে ধরা হয় না। এবং তার কারণ হচ্ছে ভৌতিকদ্রব্যের সাথে মনের ধর্মের মূলগত পার্থক্য। প্রথমতঃ, মন-নামক পদার্থটিকে দেশ-কাল দ্বারা বিশেষিত করা যায় না; অথচ যে-কোনও প্রাকৃত বস্তু বা ঘটনা দেশ-কাল দ্বারা নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, মনের বিশেষ ধর্ম চৈতন্য কোনও প্রাকৃত-ব্যাপারের মধ্যে পাওয়া যায় না; এটা একমাত্র মনেরই বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যের বা চেতন-ক্রিয়ার কোনও সম্ভাবনা জড়বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না; অথচ মানস-ব্যাপারগুলির এটাই স্বাভাবিক লক্ষণ।

কিন্তু মন যে অভৌতিক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চৈতন্য-ধর্মী পদার্থ এই মত আধুনিক মনোবিদ্যায় আর ঠাঁই পাচ্ছে না। দার্শনিক ডেকার্তে (Descartes) এই মতটিকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে মন জড় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি রাজ্য সূচিত করে। দেহের সাথে তথা বহির্জগতের সাথে মনের যে সম্পর্ক সেটা যেন নিতান্ত আকস্মিক। মন পদার্থটি যেন স্বরূপতঃ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র একটা কিছু। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্যায় মন সম্বন্ধে এই ধারণাটি অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। এমন কি নব্য-চেষ্টতবাদী মনোবিৎরা এই মতকে একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য অতিকথা হিসাবে গণ্য করতেও দ্বিধা করেন না ('Cartesian Myth'—G. Ryle, "The Concept of Mind")।

মনের যে একটি দেহব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্র স্বরূপ থাকতে পারে এটা যেন আজ শূন্যগর্ভ কল্পনায় পরিণত হয়েছে। দেহ ছাড়া সেই কল্পিত মনোরাজ্যের আশ্রয়টি কোথায়? মনকে একটি বস্তু বলব, অথচ তার দেশগত কোনও নির্দেশ থাকবে না—এ কী ক'রে সম্ভব? আর বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যাবে মানস-প্রক্রিয়াগুলি ছাড়া মন ব'লে একটি স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন, এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ ও তাদের ক্রিয়া থেকে বাদ দিয়ে তদতিরিক্ত অথচ তদন্তবর্তী কোনও নিয়ন্ত্রক শক্তিকে স্বীকার করা নিতান্ত অর্থহীন হবে। আর, এই বিভিন্ন মানস-প্রক্রিয়াগুলির দিকে, বিভিন্ন মানস-অবস্থাগুলির ('mental states') দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে দেহগত ক্রিয়ার সাথে তাদের স্থূলভাবে বা সূক্ষ্মভাবে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ দেহের বাহ্যিক সঞ্চালনগত বা প্রতিক্রিয়াগত লক্ষণ থেকে কখনও অসম্পৃক্ত হলেও আন্তর স্নায়ুনওলীগত ক্রিয়া থেকে বিযুক্ত মানস-ক্রিয়া সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না।

দেহের সাথে স্থূল বা সূক্ষ্ম এই সম্পর্ক স্বীকার করলে পরেও মূল প্রশ্নটি থেকে যায়: মনের স্বরূপলক্ষণ কী ভাবে নির্দেশ করা যাবে? নিতান্ত দেহগত ক্রিয়ার মারফৎ ব্যাখ্যা ক'রে কি মনকে উড়িয়ে দেওয়া যায়? একান্তভাবে দেহের উল্লেখে মনকে বোঝবার বা মন-প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করবার প্রচেষ্টা প্রাচীনযুগে অ্যারিষ্টটলের (Aristotle) চিন্তায় দেখতে পাই। অ্যারিষ্টটল মনকে দেহেরই আকার (form) হিসাবে গণ্য করছেন। মনের দিক্ থেকে উপাদানগত সত্তা দেহেরই রয়েছে, মন দেহের ক্রিয়ামূলক আভাস ছাড়া কিছু নয়। এই ভাব-ধারাই যেন অতি আধুনিক যুগে চেষ্টতবাদী মনোবিৎদের মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পেয়েছে। মনকে এঁরা ব্যর্থহীনভাবে দেহেরই ক্রিয়া হিসাবে লক্ষিত করছেন। ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যায় এই ঝোঁক ইতিপূর্বেই এসে গিয়েছিল। মন যা করে মন তাই। চেষ্টতবাদী ব্যাখ্যানে এই 'করা'র বিবরণটি পুরাপুরি বিষয়গত হ'ল। উদ্দীপকের (stimulas) উল্লেখে দেহজ প্রতিক্রিয়াই (response) হ'ল তথাকথিত মানস-ব্যাপারের একমাত্র পরিচয়।

কিন্তু সম্পূর্ণ দেহজ-ক্রিয়াশ্রয়ী এই ব্যাখ্যানে মনের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয়ের মূল প্রশ্নটি মিটল কি? আসল প্রশ্ন যেন এড়িয়ে যাওয়া হ'ল। কারণ, এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়কে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই—তা হচ্ছে মনের বিশেষ ওণ চৈতন্য। কিন্তু এই বহুলপ্রচলিত 'চৈতন্য' কথাটিও আবার অস্পষ্টতার দোষে দুষ্ট। চৈতন্য বলতে আমরা যেন রহস্যময় একটা স্বতন্ত্র জগতের কোনও ব্যাপার বুঝি, যার সাথে আত্মা ইত্যাদি প্রত্যয় এসে জুড়ে তাকে আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছে। একে সহজভাবে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। যখন আমরা বলি মন চেতন, অথবা মানস-ব্যাপারগুলি চেতন-ব্যাপার, তখন তা দ্বারা আমরা এই বুঝি নাকি যে মন বা মানস-অবস্থা-গুলি একটি বিশেষভাবে সক্রিয়—যে-ক্রিয়মাণতা ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে অর্থাৎ জড়বস্তুতে সম্ভব নয়। আর জড়-বস্তুতে আশ্রিত ক্রিয়ার সাথে এর তফাৎ এই যে তার মতো চৈতন্যরূপী ক্রিয়া বা প্রকাশের বিশেষ স্বভাবটি নিছক বহির্মুখী-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। আন্তরদৃষ্টিতেই মানস-ব্যাপারগুলির চৈতন্য-ধর্মিতা ধরা পড়া সম্ভব। অবশ্য মানস-ব্যাপারগুলির অতিরিক্ত কোনও চৈতন্যপদার্থ বা চৈতন্য-সামান্য রয়েছে কিনা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা, মনের একটি আন্তর ক্রিয়া-মাণতা অনস্বীকার্য। দেহ-মাধ্যমে বা বাহ্য-উদ্দীপকের উল্লেখে যে বহিঃক্রিয়ার প্রকাশ তা মনের বাহ্য-লক্ষণকে সূচিত করতে পারে, কিন্তু আন্তর-লক্ষণকে নয়।

তা হলে আমরা ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তেই যেন উপনীত হই যে মন হচ্ছে চেতন-ব্যাপারসমূহ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। মনের বা মানস-ব্যাপারের কথিত চেতনরূপতা পরিস্ফুট নাও হতে পারে—এবং আমাদের মানস-জীবনের একটি বিরাট্ অংশ তা নয়। এখানেই 'নির্জ্ঞান' (unconscious) মনের কথা ওঠে। নির্জ্ঞান মন বলতে কোনওক্রমেই অচেতন জড়-মন বোঝায় না। যা বর্তমান-সুস্পষ্ট-চৈতন্য দ্বারা বিশেষিত না হয়েও সম্ভাব্য-চৈতন্য-বিশিষ্ট তাই নির্জ্ঞান মন। যা অস্ফুটরূপে চেতন তাই মনোবিদ্যার ভাষায় নির্জ্ঞান মানস-ব্যাপার। সুতরাং মন অর্থাৎ মানস-ব্যাপার ব্যক্তভাবে বা অব্যক্তভাবে চৈতন্যের উল্লেখ-বর্জিত নয়।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় কোনও কল্পিত মনোরাজ্যের নিয়মকানুন আবিষ্কার করা মনের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। কিংবা দেহগত ক্রিয়া বা ব্যবহারের বিবরণ, বিশেষ পরিবেশে অবস্থিত জীবদেহের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপকের ফলে বিশেষ প্রতিক্রিয়ারাশির যান্ত্রিক মাপজোখ মনোবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য নয়। বাহ্যিক ব্যবহারগত পর্যবেক্ষণ মনোবিদ্যায় প্রয়োজন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রধানতঃ লক্ষ্য থাকবে সেইসব বহির্লক্ষণের পশ্চাদ্‌বর্তী চেতনাবস্থাটিকে আন্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা। পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিমানসের অন্তর্গত, সংবেদন, রক্ষণ, অধ্যবসায়, অনুভূতি ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত যে প্রেষণা (motivation) ও প্রতিন্যাস (attitude) তাই শেষপর্যন্ত মনোবিৎদের আগ্রহের বিষয় হবে। সর্ব স্তরে পরিবেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখে মনের যে ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি তার সম্যক্ ও সুসংবদ্ধ পরিচয় লাভ করাই মনোবিদ্যার লক্ষ্য।

ঝগড়াটে মন

ধণপতি বাগ, এম.এস্‌সি.*

পণ্ডিতজনে ব'লে থাকেন, যে-লোক কখনও আলো নিজের চোখে দেখে নি তাকে আলো যে কি তা বোঝানোর চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। শুধু আলো কেন, এ কথা বোধ হয় সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের পক্ষেই খাটে। যে কখনও জল দেখে নি তাকে জলের স্বরূপ আপনি যতই ব্যাখ্যা করুন না কেন, তা কি সে বুঝবে? যে কখনও গোলাপের গন্ধ নিজে ঘ্রাণ করে নি তাকে কি আপনি অন্য ফুলের গন্ধ থেকে গোলাপের গন্ধের কি প্রভেদ তা বোঝাতে পারবেন?

আমার আজকের বক্তব্য-বিষয়টি প্রকাশ করা যতই কঠিন হ'ক উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির মতো অত শক্ত নয়। কারণ, এমন মানব-সন্তান আছেন বলে জানা নেই যিনি ঝগড়া-বিবাদ করেন না। আপনারা হয়তো খুব অবাক হচ্ছেন, কেউ কেউ বা ইতিমধ্যেই চটে উঠেছেন। ভাবছেন হয়তো, সামনে পেলে.....কি করতেন সামনে পেলে? কি আর, একচোট ঝগড়া ক'রে নিতেন, মানে তর্ক করতেন আর কি! ওই একই কথা—তর্কটা ঝগড়ার রূপান্তর বৈ তো নয়। যাক, তাই ব'লে কিন্তু সকলকে ঝগড়াটে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়।

মনোবিৎদের, বিশেষ ক'রে মনঃসমীক্ষকদের ঐ কেমন একটা দোষ। তাঁরা, কোনও একটা সূত্র পেলেই হ'ল, সেটা ধ'রে ডুবে ডুবে এমন একটা জায়গায় গিয়ে জাগবেন যেখানে পুর্ব সূত্রের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আপনার-আমার মতো ভদ্রলোকের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। এই যে আগেই বললাম, তর্ক ও ঝগড়া একই জিনিসের রূপান্তর—এ তাঁদেরই কথা। জিনিসটা আসলে একই, তবে তাদের প্রকাশ্য রূপটি ভিন্ন। এটা যদি আপনি একবার স্বীকার করে নেন, তখন আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে তাঁরা বলবেন, ঝগড়া হচ্ছে মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তির বিকৃতাবস্থার ভদ্রোচিত প্রকাশভঙ্গী মাত্র। কোনও পণ্ডিতলোক জোর ক'রে বললে কি আর করা যায়। তা ছাড়া, এমন কথা শুনলে মনে ঔৎসুক্য জাগা খুবই স্বাভাবিক। চোখের সামনে যেটাকে দেখছি বা নিজে অনুভব করছি সেটাকে একরকম বোঝা যায়। কিন্তু চোখের বাইরে এর রূপ কী হতে পারে? এমন প্রশ্ন মনে ওঠা শিক্ষিত মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। জানতে চাওয়াটা তো সোজা, কিন্তু বলতে পারা যে খুব মুশকিল।

যিনি নিজে ঝগড়া পছন্দ করেন না এবং ঝগড়া করতে পারেন না তেমন লোক কাউকে ঝগড়া করতে দেখলে ব'লে বসেন, যত সব ছোটলোকের কাণ্ড। বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হলে এঁরা হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন ভদ্রলোকের বাড়িতে এ সব ছুলে-বাগদীর কাণ্ড অসহ্য, থামাও। এঁদের এই সব কথা থেকে মনে হয় ছুলে, বাগদী ইত্যাদি যাদের এঁরা ছোটলোক ব'লে আখ্যাত করেন, ঝগড়াটা বুঝি তাদেরই একচেটিয়া। তা কিন্তু নয়। তবে ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝগড়াটা ভদ্রোচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কল্পনা করতে হবে না, ভদ্রসমাজে সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে এমন একটি দৃষ্টান্ত দিই।

বাড়ির কর্তা রবিবারের অবসরে বৈঠকখানায় ব'সে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তুমুল তর্ক চালাচ্ছেন, এ দিকে বাড়ির কর্ত্রী হয়তো অন্দরমহলে ঝি-চাকরানীর দেরী ক'রে আসার জন্য দু-চার কথা বলাতে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়েছে। আবার দেখুন বাইরে বস্তির মুখে রাস্তার কলে জল ধরা নিয়ে দুই দলে তুমুল কোঁদল লেগে গেছে। এসব শহরে বসেই আমরা দেখতে পাই। এই তর্ক, কথা-কাটাকাটি বা কোঁদল—এগুলোকে কি একসূত্রে গাঁথা চলে না? এমন কাণ্ডগুলো বাধে কেন? এ প্রশ্ন করলে সহজেই দেখা যাবে যে, সর্বত্রই মতভেদ হয়েছে। একজন বা একদল যা মনে করে বা বিশ্বাস করে, অন্যজন বা তার দল তা করে না। এই একদল অন্যদলকে যতক্ষণ না তাদের নিজেদের বক্তব্য বা বিশ্বাসকে গ্রহণ করাতে পারছে ততক্ষণ এই ব্যাপারের শেষ নেই। এখন এর শুরুটা ইচ্ছাকৃত হতে পারে, আবার অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। বন্ধুতে বন্ধুতে তর্ক যে শেষপর্যন্ত ঝগড়ায় গিয়ে ঠেকবে না তা হলফ ক'রে বলা যায় না। আবার কলতলায় ভনার মা গিরির মাকে দেখতে পারে না ব'লেই, তা সে হিংসে বশতই হ'ক, আর যে কোনও কারনেই হ'ক—হয়তো সামান্য তুচ্ছ কারণে গণ্ডগোলটা বেধে উঠে তুমুল কাণ্ড লেগে গেছে। গিন্নীর সঙ্গে দাসীর ঝগড়ার কারণটা কর্তার কাছে যত তুচ্ছই মনে হ'ক, গিন্নী কিন্তু জানেন তুচ্ছ কথা নিয়ে তিনি ঝি-বাঁদীর সঙ্গে কখনও কথা-কাটাকাটি করেন না। এমনি ভাবে দেখা যায়, বিবাদে-প্রবৃত্ত দুই পক্ষেরই নিজ নিজ মতকে প্রাধান্য দেওয়ার ঝোঁকটা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। উভয় পক্ষই মনে করছেন যে, তিনিই হক কথা বলছেন; তাঁর প্রতিপক্ষ ভুল করছেন, অন্যায় করছেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে আপনাদের হয়তো ধারণা হতে পারে ঝগড়া-বিবাদ বাদ্‌তে হলে অন্তত পক্ষে দুটো ভিন্নমতাবলম্বী দল থাকা দরকার। সাধারণতঃ তাই হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সব সময় তার দরকার হয় না। একদলেই, এমন কি ঝগড়ার তুমুল ঝড় তুলতে একটি লোকই যথেষ্ট হতে পারে। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু আমি নিশ্চিত, জানি আপনাদের অনেকেরই এরূপ ঘটনা জানা আছে। এখন কেবল স্মরণ করতে পারছেন না। তাই একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই ঘটনাটি হয়তো অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে তবুও আমার প্রত্যক্ষ করা বলেই আপনাদের কাছে ভরসা করে পেশ করতে পারছি।

একটি চাষী পরিবার। কোনও রকমে খেটেখুটে ধার-দেনা ক'রে সারা বছরটা ঘুরে যায়। সংসারে স্বামী-স্ত্রী ও চারটি নাবালক ছেলে। মেয়ে নেই সংসারে। কাজেই বিয়ের ভাবনা বাপকে যেমন করতে হয় না, মায়েরও তেমনি হাত-ঘুরকুত ব'লে কেউ নেই। বড় ছেলে-দুটো বাপের সঙ্গে থেকে একটু-আধটু কাজ-কর্ম করে। বাকীগুলো দিগম্বর হয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, আর মাঝে-মাঝে বাড়িতে এসে ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে মাকে বিরক্ত করে। আমরা দেখতাম সকাল থেকে এই মা-টি মুখ বুজে রাজ্যের কাজ-কর্ম ক'রে চলেছে। তার টুঁ শব্দটি কেউ শুনতে পেত না। কিন্তু আশ্চর্য, দুপুরে একটি সময়ে সে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করত কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে। সেই ধ্বনি বাতাসের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ত দিকে-দিগন্তরে। খুব কম ক'রে হলে আধঘণ্টা, এক এক দিন কয়েক ঘণ্টা ধরেই থেকে থেমে এই শব্দতরঙ্গ পাড়াপড়শীর কর্ণকুহরে কূজন ক'রে চলত। কিন্তু আশ্চর্য, কোনও দিন শুনি নি এই নিয়ে তার সঙ্গে পাড়ার অন্য মেয়েরা কোনও কথা বলছে; হয়তো অবশ্যম্ভাবী বলেই সকলে মেনে নিয়েছিল। কিংবা বিপিনের মার প্রতি তাদের একটি গভীর সহানুভূতিও থাকতে পারে। কেবল এক-এক দিন শুনতাম, আমাদের বাড়িতে মেয়েরা বলছে, ঐরে, বিপিনের বাবা বাড়ি ফিরলো। বিপিন হচ্ছে এদের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম। এটি ছিল নিত্য ঘটনা। দিনে দুবার এই ঘটনা ঘটত। প্রথমবার, যখন বিপিনের বাবা মাঠের কাজ সেরে ধুলো-কাদা-মাখা ঘর্মাক্ত কলেবরে বুভুক্ষু অবস্থায় দুপুর গড়িয়ে যাবার পরে বাড়ি ফিরত। আর দ্বিতীয়বার সন্ধ্যায়—যখন মাঠ থেকে গরু-বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে দিনের কাজ সমাধা ক'রে বাড়ি ঢুকত বিপিনের বাবা ঠিক সেই সময়টিতে, যখন গ্রামের ঘরে ঘরে বধূরা তুলসীতলায় আলো দিচ্ছে,

* সমাজশিক্ষা শিক্ষণ-কেন্দ্রের মনোবিদ্যার উপাধ্যায় (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)।

কিংবা ঘরে ঘরে ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাঁখের ধ্বনির সঙ্গে বিপিনের মার কণ্ঠধ্বনি মিশে এক বিচিত্র শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করত। এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা কোনওদিন ঘটে নি তা স্মরণ ক'রে হয়তো কেউ বলতে পারত; কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে বিপিনের বাবার কণ্ঠস্বর কেউ কোনও দিন শুনেছে এ কথা ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ কেউ বলতে পারবে না। এককথায় এমনি এক তরফা বাক্‌যুদ্ধ সত্যিই বিরল। কিন্তু এটি যে কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল তা ভাবলে এখনও অবাক হতে হয়।

তাই ব'লে একতরফা কলহ একেবারে অসম্ভব নয়। এই তো সেদিন এক গাঁয়ের একটি যুবক এসে সংবাদ দিল—দয়া ক'রে তাদের গাঁয়ে একবার যেতে হবে। কি ব্যাপার? কোনও বিশেষ কারণ নেই অথচ সামান্য একটি ঘটনা থেকে শুরু ক'রে একটি মেয়ে থেকে থেকে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। গিয়ে দেখি ডাক্তারি ওষুধের ঘোরে নির্জীব হয়ে প'ড়ে আছে। দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতেই ডাঙায়-তোলা মাছ জলে ছেড়ে দিলে যে অবস্থা হয় তাই হ'ল। সে অনর্গল কথা বলে চলল। শুরু করে প্রশ্ন ধ'রে। কিন্তু দু-চারটে সংলগ্ন কথা ব'লেই প্রলাপ বকতে থাকে। আর সে কী তার ভঙ্গী! দস্তুরমতো যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু শত্রু তার সামনে নেই। শত্রু কে তাও হয়তো সে জানে না এবং কোনও দিন জানতে পারবেও না। কিন্তু তাই ব'লে যদি ধ'রে নেওয়া যায় সে নিছক হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তা হলেও ভুল হবে। আসলে হয়তো তার কোনও শত্রু নেই, কিন্তু তাতে কী আসে যায়। ঝগড়া করবার প্রয়োজন হলে একটা শত্রু কল্পনা ক'রে নিতে দোষ কি? এ রকম কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত কি শোচনীয় অবস্থা হয় তা যদি স্বচক্ষে দেখতে চান তা হলে একবার লুথিনিতে উঁকি মারলেই দেখতে পাবেন।

তা হলে কি আমাদের বিপিনের মা পাগল ছিল? না, তা নয়। কিন্তু এটা তো ঠিক—বিপিনের মা মুখে যা সব ব'লত সেগুলো যে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছিল এ কথা ধ'রে নিলে খুব ভুল হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি হয়তো বিপিনের মার নিজের মধ্যেই ছিল। আর সেই কথাটিই তার স্বামী চাষাভুষো লোক হলেও নিশ্চয়ই বেশ বুঝতে পেরেছিল, তাই কোনও দিনই এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাগ্‌-বিতণ্ডা সে করে নি।

এই ঘটনাটি আমি একবার জনৈকা উচ্চশিক্ষিতা মহিলার কর্ণগোচর করেছিলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা এমন ঝগড়াটে স্ত্রীলোকের কথা কি আপনি কখনও শুনেছেন? তিনি উত্তরে আমায় বলেছিলেন—ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীর মতো পুরুষও কি আপনি কোথাও দেখেছেন? অলমতি বিস্তারেন।

কলহের যদি প্রকার ভেদ করতে হয় তা হলে এই রূপ কলহকেই আমাদের আসল কলহ বলা উচিত। অর্থাৎ যেখানে মানুষ তার মন-পোষা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজের অজ্ঞাতে লড়াই ক'রে চলেছে সেই কলহের বাহ্যিক প্রকাশকেই বলা উচিত আসল কলহ। অবস্থা-বিশেষে একে অনিচ্ছাকৃত কলহ বা স্বায়ী কলহও বলা যেতে পারে। এই রূপ কলহের ক্ষেত্র কিন্তু সুদূর প্রসারী। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে এ ধ'রে নেবেন না যে, এরূপ কলহ কেবল পাগলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিপিনের মাকে তার পড়শীরা আর যাই বলুক, পাগল কোনও দিন বলে নি। তেমনি সমাজে সংসারে বহু লোক সর্বদা দেখা যাবে যাদের কলহ-ঝগড়া এই প্রকৃতির। তাদের আসল রূপটা ধরতে যা একটু সময় লাগে। মনঃসমীক্ষকেরা সহজেই এরূপ লোককে চিনতে পারলেও, এই কলহপরায়ণ লোকেরা যেমন নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ তেমনি সাধারণ লোকের পক্ষে এইরূপ কলহের আসল কারণ নিরূপণ ক'রে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাও কষ্টকর। এই আসল কলহের প্রকাশের প্রকারভেদ এত বিচিত্র যে তা বিশ্বাস করাই শক্ত। তার আভাস আমি এই প্রবন্ধের গোড়াতেই দিয়েছি। বৈঠকখানার ঝুনো তার্কিক এবং লুথিনির কলহপরায়ণ

রোগীকে একদিক থেকে দেখলে একই গোত্রীয় ব'লে প্রতীয়মান হবে। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে পূর্বোল্লিখিত বিপিনের মা ও শরৎচন্দ্র-বর্ণিত রাসমনি, স্বর্ণপ্রভা প্রভৃতি এবং আমাদের পরিচিত ছোট বড় অনেককেই সুবিধামত বসিয়ে দিতে পারেন।

আর যে-সব কলহ, যার মূল মানব-মনের অজ্ঞাত কোঠরে বাসা বেঁধে নেই, যা কোনও উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মানুষ সজ্ঞানে কারণ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে বাধিয়ে তোলে, তাকে আমি বলব নকল কলহ। দরকার মতো একে ইচ্ছাকৃত কলহ বা সাময়িক কলহও বলা যেতে পারে। এই জাতীয় ঝগড়াঝাঁটিরও প্রাচুর্য কম নয়। একবার রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই তা দেখতে পাবেন। দলগত সুবিধা আদায় করার জন্য বিরুদ্ধ-পক্ষ একটি খাড়া ক'রে নানা ধুয়ো তুলে তাকে রাজনীতির রূপ দিয়ে কেমন নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হাসিল করার ফন্দি অহরহ চলছে। আইন-সভায় বা কোনও মিটিং-এ ব'সে যার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হ'ল সভার বাইরে এসে তারই কাঁধে হাত দিয়ে আবার একসঙ্গে পথ চলতে এদের বাধে না। এ এক জাতের লোক। আইন-সভার কথা বাদ দিয়ে ঘরোয়া সমাজের মধ্যেই আজকাল সবাই আমরা এদের অল্পবিস্তর চিনি; কাজেই অধিক কিছু বলা বাহুল্য।

এ জাতীয় কলহপরায়ণ লোক সমাজের সর্বস্তরেই রয়েছে—শহরে, গ্রামে, শিক্ষিতের মধ্যে, অশিক্ষিতের মধ্যে, কোথাও বাদ নেই। তাই বলছিলাম এইরূপ ইচ্ছাকৃত ঝগড়াটের দলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। শরৎচন্দ্র-বর্ণিত গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও ধর্মদাস চাটুজ্যের কলহের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

প্রথমেই বলেছি ঝগড়া জিনিসটা মানবজীবনে এত সাধারণ এবং এত পরিব্যপ্ত যে, একদিকে যেমন সহজে চোখে পড়ে না তেমনি একবার দেখতে শুরু করলে আর শেষ করা যায় না। তাই এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে এর যথাযোগ্য আলোচনা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে যা বলেছি তার থেকেই যথেষ্ট তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু সেরূপ তর্ক তুলে তার মীমাংসা করা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। যদি একান্তই পাঠক-পাঠিকার তর্ক-ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে তা হলে নকল কলহের সৃষ্টি ক'রে একটা মীমাংসার চেষ্টা করতে পারেন। সেই সুযোগে আমরা বিশ্রাম্ভে সেতে পারি।

না, এক্ষুনি পালালে আপনাদের তর্কটা বেশ জমাটি নাও হতে পারে; তাই যাবার আগে আরও দু-একটি কথা ব'লে যেতে চাই। যেমন, অনেকেরই ধারণা মেয়েরাই বুঝি বেশী ঝগড়াটে হয়। এটা একটা কথার কথা। এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নেই। পুরুষরাও খুব ঝগড়া করে। তবে মেয়েদের এই দুর্নাম রটেছে তার কারণ বোধ হয় মেয়েরা কলহের সঙ্গে গোলমালটা একটু বেশী করে ব'লে। আপনাদের তর্ক-সভায় এটারও একটু বিচার ক'রে দেখা দরকার।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা ব'লে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে ঝগড়া-প্রকাশের মাধ্যম। মেয়েরা আওয়াজ বেশী করলেও তাদের কোঁদলের চেয়ে পুরুষদের চুপে চুপে টিপ্পনী কাটা, বা মেয়েরা যাকে বলে ফোড়ন কাটা, বিরুদ্ধ পক্ষের কম গাত্রদাহের সৃষ্টি করে না। কাজেই কলহটা সরবে ও নীরবে দু ভাবেই হতে পারে। এ নিয়ে অধিক কিছু বলা বাহুল্য।

নীরব ঝগড়ার কথা বাদ দিয়ে যদি সরব কলহের কথাই একটু বিশেষ ক'রে চিন্তা করা যায় তা হলে দেখা যাবে দুই পক্ষের বাক্যবাণের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব নানারূপ অঙ্গভঙ্গী যুক্ত হচ্ছে তা যেন কলহকে জীবন্ত ক'রে তুলছে। ইট-পাটকেল ছুড়লে যদিও আজকাল পুলিসে ধ'রে নিয়ে যায় কিন্তু ঝগড়ার অঙ্গরূপে যে-সব অশ্লীল বাক্যবাণী প্রযুক্ত হয় এবং মাঝে মাঝে ঐ বাণীর সঙ্গে তাল রেখে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা, এমন কি পুরো শরীরটার বিচিত্র ভঙ্গিমা দিয়ে, যে-সব অর্থ মূর্ত করা হয় তা যিনি না দেখেছেন তাঁর পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। আর এমন জিনিস প্রত্যক্ষ ক'রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কথা ভাবাও অস্বস্তিকর। তাই সে চেষ্টা না ক'রে বরং এ বিষয়ে মনঃসমীক্ষকেরা কি বলেন

সেইটিই দেখা যাক।

অল্প-স্বল্প ঝগড়াঝাঁটির কথা ছেড়ে দিয়ে যদি পূর্বোক্ত তুমুল কলহের বিচার ক'রে দেখা যায় তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই তুমুল অবস্থাটির সৃষ্টি সব সময়ে হঠাৎই হয় না। এর শুরু হয়তো তুচ্ছ কারণে হতে পারে। কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে কোনও ব্যক্তি-বিশেষের অবদানের ফলে এক সময়ে ভীষণ রূপ ধারণ করে। একেবারে বিনা কারণেও কলহের সূত্রপাত হতে দেখা যায়, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যদি ইচ্ছা করেন 'বামুনের মেয়ে'র 'মাসি'র কাণ্ডটি একবার স্মরণ করুন। এটি হয়তো সাহিত্যিকের কল্পিত হতে পারে, কিন্তু এমন ঘটনা, এমন কি এর চেয়ে অনেক গুরুতর ঘটনা আমরা সমাজের নানাস্তরে আজও ঘটছে দেখতে পাব।

মনঃসমীক্ষকেরা বলেন যে, সব আসল কলহের ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে মানব-মনের এক অতৃপ্ত আদিম-ইচ্ছার সন্ধান। ঐ ইচ্ছাটি স্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত হতে না পেরে এই বিকৃতরূপ নিয়েছে। অন্য আরও অনেক রূপ ধ'রেই ইচ্ছাটির প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গী নানা কারণের ওপর নির্ভর করে। তাই এর আসল কারণটা খুঁজে বার করতে হলে বিবদমান ব্যক্তিদের মনের ভিতরটার কিছু সন্ধান নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মনঃসমীক্ষকেরা আরও বলেন যে, ঐ ইচ্ছাটার জন্ম হচ্ছে মানুষের যৌন-জীবনে। এঁরা কিন্তু উন্মাদ রোগের কারণ দেখাতে গিয়েও ঐ কথাই বলেছেন। তাই এই কলহটাকে এক প্রকারের উন্মাদ রোগ যদি বলা হয় তা হলে নিশ্চয়ই ভুল হবে না। তবে কারও কারও মনে যে আপত্তি উঠতে পারে তা স্বীকার করি।

এই যে কারণটির কথা আমি উল্লেখ করলাম এতে যাঁদের আপত্তি আছে তাঁদের আমি অনুরোধ করব কুলী-মজুরদের বস্তিতে বা গলির মোড়ে কল-তলায় মাঝে মাঝে ঝগড়ার যে তুমুল ঝড় ওঠে তারই দু-একটি স্বচক্ষে দেখতে। এর জন্য প্রচুর ধৈর্য দরকার। সুরুচি-সম্পন্ন লোকের পক্ষে এরূপ দেখা-শোনা করাটা একান্তই শালীনতাবিরুদ্ধ। যে-সব অশ্লীল ভাষা এবং যৌন-ক্রিয়া সম্পর্কীয় ভঙ্গীর প্রকাশ এতে আপনি দেখতে পাবেন তাতে মনঃসমীক্ষকদের মতামত সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ যে আপনার থাকবে না তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায়। এই কলহের মধ্যে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। দেখলে মনে হবে, কলহকারী লোকগুলির মুখে যেন কু-সরস্বতী ভর করেছে। অনর্গল বাক্যবাণ বেরিয়ে আসছে, যাকে বলে স্বতঃস্ফূর্ত। আর তারা কি পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন, না আপনার উপস্থিতির তাৎপর্য বোঝবার মতো তাদের অবসর আছে? মোটেই না। তাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে যে তারা তৎকালীন নিজের একটি কল্পিত জগতের মধ্যে যেন চলা-ফেরা করছে, অভিনয় ক'রে চলেছে। আর এ সব ঘটনাস্থলে দর্শকদেরও অভাব দেখবেন না। চারিদিকে বিনা-টিকিটের দর্শক দাঁড়িয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করছে।

মানসিক হাসপাতালেও এমন দৃশ্য দুর্লভ নয়। কথা হচ্ছে হাসপাতালে যারা আছে তারা তো পাগল। কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে পথে-ঘাটে যারা ছাড়া রয়েছে তারা কী?

কথায় কথায় অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনও একটি খুব সাধারণ কথা বলা হয় নি। যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমরা ঝগড়া করি কেন—হঠাৎ যে উত্তরটা মুখে আসবে সেটি হচ্ছে, আমাদের আত্ম-অহঙ্কারে আঘাত লাগা, অর্থাৎ আত্মাবমাননাবোধ। অহম্-বোধটা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে; এই অহম্‌কে আমরা ভালও বাসি। কিন্তু যেখানে 'অতি-অহম্'-বোধটা প্রকট সেখানে সহজেই অপরের আচরণে বা কথায় যখন সেই বোধে আঘাত লাগে তখন আত্মা-বমাননাবোধ জেগে ওঠে। এই বোধ থেকে ফিরে পাল্টা আঘাত করতে ইচ্ছা জাগে, যার এক রকমের প্রকাশের ফলে মনে আস্তে আস্তে ঝগড়ার দানা বাঁধতে থাকে। পরে কোনও উত্তেজনার বশে ভিতরের ঐ

(শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যোগ্যতা-নিরূপণের গুরুত্ব

সুনীলচন্দ্র বিশী, এম.এস্‌সি.*

সব কাজের যোগ্যতা সকলের সমানভাবে থাকে না। কাজের যোগ্যতা আছে তখনই বলা যায় যখন কেউ কোনও কাজ সাফল্যের সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে ক'রে থাকে।

সকলের প্রকৃতি সমান নয়। বিভিন্ন লোকের আগ্রহ বিভিন্ন ধরনের। কেউ জটিল কাজ সম্পাদনে উৎসাহ পায়, আবার কেউ তা এড়াতে চেষ্টা করে। কেউ চায় বুদ্ধির কাজ, কেউ তা চায় না। একঘেয়ে কাজে কেউ বিরক্ত হয়ে ওঠে, কেউ তাই ক'রে আনন্দ পায়। কোনও বিশেষ কাজ করতে কেউ আত্মসম্মানে আঘাত পায়, আবার কেউ সেই কাজই সুষ্ঠুভাবে বেশ তৃপ্তিসহকারে করে। কেউ চায় কাজে সম্মান, কেউ চায় অর্থ, কেউ চায় যশ, আবার কেউ শুধু কাজ করতে ভালবাসে ব'লেই কাজ করে। একই কাজে অনেক দিন, এমন কি জীবনের শেষদিন পর্যন্তও টিকে আছে এমন অনেক লোক দেখা যায়। আবার এমন লোকও আছে যারা চাকুরির পর চাকুরি ধরে আর ছেড়ে দেয়—সেই সঙ্গে বৃত্তিও হয়তো বদলে যায়। একই বৃত্তিতে কেউ খুব সফল ভাবে কাজ ক'রে চলে, কেউ মোটামুটি কাজ সামলায়, আবার কেউ একেবারেই সুবিধে ক'রে উঠতে পারে না।

শ্রমশিল্প প্রবর্তনের পূর্বে কর্মক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এত রকম বিভিন্নতা ছিল না। এখন যেমন নানাপ্রকারের বৃত্তি দেখা যায়, তখন তা ছিল না। কৃষিই ছিল সাধারণের জীবিকানির্বাহের প্রধান বৃত্তি। শ্রমশিল্পে উৎপাদন নির্ভর করে যন্ত্র ও মানুষের একটি সুসংহত প্রক্রিয়ার ওপর। শুধু যন্ত্র হলেই উৎপাদন হয় না। সমপরিমাণে উৎপাদন ক্ষমতা যন্ত্রগুলির মধ্যে নিহিত থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে ঐ যন্ত্রগুলি যারা চালনা করছে তাদের কর্মদক্ষতা ও মানসিক স্থৈর্যের সামঞ্জস্য না থাকার দরুন উৎপাদনে তারতম্য ঘটছে। এর জন্য যে শুধু দেশের অথবা শিল্পপতিদেরই ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, এতে ব্যক্তিগতভাবে কর্মীরও যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়।

বৃত্তি-নির্বাচনে যার ভুল হয় তার জীবনটাই হয়ে ওঠে সমস্যাময়। এই ভুলের জন্য সে দেশের, সমাজের ও নিজের ক্ষতি করে। বৃত্তি-নির্বাচনে ভুল ক'রে যে কাজ নেয় তাতে তার মন বসে না, তাতে সে তৃপ্তি পায় না। এবং কাজে মনোযোগ দিতে না পারায় অসাফল্যের আশঙ্কায় সে সর্বদাই চিন্তান্বিত থাকে। তখন মেজাজ হয়ে ওঠে রুক্ষ। সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার মতো মনের অবস্থা থাকে না। তাদের ওপর গড়ে ওঠে মনে মনে ঈর্ষা। স্বজনপরিজনের মধ্যেও আনন্দ পায় না। সামান্য কারণেই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কাজে মনোনিবেশ না করতে পারার দরুন আপতনও (accident) ঘটতে পারে, কিংবা বহু মূল্যবান যন্ত্রাদির ক্ষতিসাধনও অজানিতভাবে ঘটতে পারে। এ-রকম কাজ থেকে মন দূরে থাকতেই চায়। তাই কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির মাত্রাও হয়ে পড়ে বেশী। এবং এই ক'রে একদিন হয়তো তাকে কার্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হয়। তখন সে হয়ে পড়ে সমাজের পক্ষে একটি বোঝা মাত্র। কিন্তু যে-কাজে তার যোগ্যতা আছে, সেটা যদি সে বেছে নিতে পারত

*ভারতীয় আয়ুধনির্মাণ সংস্থার অধিক্ষক-মনোবিৎ।

তবে তার আর এ দুর্ভোগ হ'ত না। সহকর্মীদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে সে জীবন ভোগ করতে পারত।

সকলেই যে সকল বৃত্তির জন্য উপযুক্ত হতে পারে না তা পূর্বেই বলেছি। কারণ বিভিন্ন বৃত্তিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি, আগ্রহ ও অন্যান্য গুণাবলী সকলের মধ্যে সমভাবে থাকে না। এখন আমাদের জানতে হবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ কি ভাবে হয়? শিশুদের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা আছে—এটা একটু নজর করলেই দেখা যায়। কোনও শিশু তাড়াতাড়ি শিখছে, কেউ তা পারে না। কোনও শিশুর স্মৃতিশক্তি খুব বেশী, কারও বা কম। কেউ খুব চঞ্চল, কেউ বা ধীর-স্থির। শিশুরা যখন খেলা করে তখনও দেখা যায় যে বিভিন্ন শিশুর মন বিভিন্ন খেলার দিকে। কারও ভয় খুব বেশী, কারও সাধারণের মতো, আবার কারও মধ্যে ভয় একেবারেই নেই। তাদের আগ্রহও বিভিন্নমুখী। বংশগত গুণ ও পরিবেশ এ দুয়ের সম্মিলিত প্রভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হতে থাকে। এ দুয়ের কোন্‌টার গুরুত্ব বেশী, কোন্‌টার কম, অথবা দুয়েরই গুরুত্ব সমান কিনা এ নিয়ে মনোবিৎরা বহু গবেষণা করেছেন, কিন্তু এখনও তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে বংশগত গুণই শিশুর ব্যক্তিত্বস্ফুরণের প্রধান সহায়ক। তাঁদের মতে অনুকূল বংশগত গুণাবলী যদি শিশুর মধ্যে থাকে তবে যে-পরিবেশেই সে মানুষ হ'ক না কেন তারা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ তার পক্ষে অনুকূলই থাকবে। কিন্তু যাঁরা পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা বলেন যে শিশুর ব্যক্তিত্ব পরিবেশের ওপরই নির্ভর করে। পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তবে সব শিশুর সমভাবেই ব্যক্তিত্বস্ফুরণ হতে পারে। বংশগত গুণ ও পরিবেশ এ দুয়ের কোনও একটার ওপর বেশী গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে দুয়েরই গুরুত্ব সমান এটা মনে করাই নিরাপদ—কারণ এর সঠিক সমাধান মনোবিৎরা এখনও করতে পারেন নি।

সব শিশুই এক ধরনের বংশগত গুণাবলীর অধিকারী হয় না, কারণ তাদের জন্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন বংশে। আবার সব শিশুর পরিবেশও এক রকম হয় না। কেউ ধনী পরিবারে, কেউ দুঃস্থ পরিবারে, কেউ শহরে, কেউ গ্রামে, কেউ শিক্ষিত পরিবারে, কেউ অশিক্ষিত পরিবারে মানুষ হয়। বিভিন্ন শিশু তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকেও বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার পায়। কোনও অভিভাবক সন্তানকে মানুষ করতে খুবই যত্ন নেন, আবার কেউ তাদের ওপর হয়তো মোটেই নজর দেন না। শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন বংশগত গুণাবলীর অধিকারী হয়েও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে শিশু বড় হতে থাকে। সুযোগ ও সুবিধা মতো মানসিক বৃত্তিগুলি তাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হতে থাকে এবং যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তাদের ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়।

এইজন্যেই দেখা যায় তাদের মধ্যে বিভিন্নতা। সমাজে তাদের সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কোনও-না-কোনও বৃত্তি গ্রহণের উপকরণ তাদের মধ্যে থাকেই। কিন্তু সব বৃত্তির উপকরণ তাদের সকলের মধ্যে সমানভাবে পাওয়া যায় না।

বৃত্তি-নির্বাচনে মানুষের যে ভুল হয়, তার জন্য তাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। প্রতিটি লোকই প্রাপ্ত-বয়স্ক হবার পর, যদি তার শিক্ষা শেষ হয়ে থাকে, কোনও-না-কোনও বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। ঠিক কোন্ বৃত্তিতে তার যোগ্যতা আছে সে সম্বন্ধে তার বড় বেশী জানা নেই। সে ভাবে যে-কাজই পাই তাই-ই সাফল্যের সঙ্গে করতে পারব। সুতরাং যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই সে প্রবেশ করে। ভবিষ্যতের কথা সে চিন্তাই করে না।

অনেক-ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা কিংবা লৈখিক পরীক্ষা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৌখিক ও লৈখিক দুরকম পরীক্ষার দ্বারাই কর্মক্ষেত্রে লোকসংগ্রহ করা হয়ে থাকে। চিরাচরিত এই প্রকার প্রথার দ্বারা

পরীক্ষাতে কর্মপ্রার্থীর সাধারণ জ্ঞান অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানের বিচার করা যায়। শুধু মৌখিক পরীক্ষাতে অনেক সময় তাও হয় না। কারণ পরীক্ষা-স্থানের পরিবেশের ওপর প্রার্থীর উত্তরদান নির্ভর করে। সে যদি ওই পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে বিচলিত হয়ে পড়ে তবে সে যা জানে তাও বলতে পারে না, যা জানে সবই গুলিয়ে যায়। মৌখিক পরীক্ষায় অবশ্য প্রার্থীকে সামনে চাক্ষুষ দেখে তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায় এ কথা সত্য; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ভুলও হতে পারে। লৈখিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করা যায় না।

দেখা গেছে যে মনোবিৎদের সাহায্য নিয়ে লোক সংগ্রহ করলে সুফল পাওয়া যায়। তাদের গোড়ার কথাই হ'ল "উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত লোক"। তাদের লোক-সংগ্রহের পন্থা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু ও সফলতার সঙ্গে করতে হলে কর্মীর মধ্যে চাই কাজের উপযুক্ত বুদ্ধি, আগ্রহ, দক্ষতা ও মেজাজ। এই সবের কোনটার বা কয়েকটার মাত্রা কমবেশী থাকলেই হয় বিরাট। কোন্ বৃত্তিতে সফলকাম হতে মানসিক কি কি বৃত্তির কতটা পরিমাণ প্রয়োজন—এর ওপর ভিত্তি করেই মনোবিৎরা ঐ সব বৃত্তি মাপবার জন্য উপযুক্ত অভীক্ষা গঠন (test) করেন। এই অভীক্ষাগুলি কর্মপ্রার্থীদের ওপর প্রয়োগ ক'রে তাঁরা স্থির করেন তাদের যোগ্যতা। এতে প্রার্থীর মানসিক বৃত্তি-গুলির কেবল একটা আন্দাজ মাত্র না ক'রে নির্দিষ্টভাবে গুণাগুণ বিচার করা যায়।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের সরকার, শিল্পপতি ও কর্মপ্রার্থীরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন যে সব লোক সব কাজের উপযুক্ত নয়। বৈজ্ঞানিক-পন্থায় যোগ্যতা-নিরূপণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মী-সংগ্রহের ভার অনেকক্ষেত্রেই মনোবিৎদের ওপর আজকাল দেওয়া হচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিক-পন্থায় যোগ্যতা-নিরূপণের প্রথা যদি সকল কর্মক্ষেত্রেই স্বীকৃত ও গৃহীত হয় তবেই দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হবে এবং দেশ আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে ও মানসিক অশান্তির মাত্রা বহু পরিমাণে কমে যাবে।

ঝগড়াটে মন

(১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চাপা ভাবটা ঝগড়ার আকারে বেরিয়ে আসে। সাধারণ ক্ষেত্রে এটা খুব সত্যি কথা। কিন্তু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে এইটি-ই এর শেষ কথা নয়। আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে কারণ ব'লে মনে হচ্ছে সেটি আসল কারণের সামান্য একটু ভগ্নাংশ মাত্র। সেই আসল কারণের কিছুটা হদিস আমি আগেই দিয়েছি।

অপরাধ—সামাজিক ব্যাধি

বিমল মুখোপাধ্যায়, এম. এস্‌সি. *

সৃষ্টিপ্রলয়, জীবনমৃত্যু, গতিস্থিতি, উত্থানপতন—আবহমানকাল ধ'রে বিশ্বের ইতিহাসে পরিবর্তনের পাতায় নতুন হতে নতুনতর অধ্যায়ের সূচনা ক'রে আসছে। আমাদের পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। কালের সঙ্গে, তার নিজস্ব বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, তার রূপ-রস-গন্ধের তারতম্য ঘটে। এরই নাম পরিবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তন একটা বা কতকগুলো নিয়ম ধ'রে চলে। কোনও কিছুই হঠাৎ হয় না বা হতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ বা প্রস্তুতি আছে। গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। এই ফল হঠাৎ বা শুধু শুধু কি পড়ল? ফল মাটিতে পড়ল, তার কারণ সময় বিশেষে তার বৃন্তচ্যুতি এবং মাধ্যাকর্ষণ-নামক শক্তির প্রভাব। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষও তেমনি বিশ্বের অন্যান্য সৃষ্টির মতোই কতকগুলো বিশেষ নিয়মের বাঁধনের মধ্যে চলতে বাধ্য। যেমন, দেখা গেছে মানুষ তার সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একা বাস করতে পারে নি। নানাকারণে এবং নানাপ্রয়োজনে মানুষ একজোট হয়ে বা গোষ্ঠিবদ্ধভাবে থাকবার চেষ্টা করে। এই এক একটি গোষ্ঠিকে মানুষ নাম দিয়েছে সমাজ।

বুদ্ধিজীবী মানুষ নিজের সহজাত নিরাপত্তাবোধ থেকে স্বভাবতই চেষ্টা ক'রে আসছে তার নিজের সমাজকে সুস্থ এবং অক্ষত রাখবার। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জানতে পেরেছে যে গোষ্ঠিস্বার্থের সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। তাই চেষ্টা করে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠিস্বার্থের মাঝে একটা সাধারণ ভারসাম্য বা সমতা রাখবার। কিন্তু নিয়মের রাজত্বে কখনও কখনও এই ভারসাম্যের ব্যতিক্রম সমাজে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এই অবস্থা সমাজের মধ্যে দৈহিক ব্যাধির মতোই সামাজিক ক্ষত বা ব্যাধির সৃষ্টি করে।

মানবসভ্যতার মধ্যযুগে এর চিকিৎসা হত ক্ষত বা ব্যাধিযুক্ত অঙ্গের আমূল উচ্ছেদসাধন ক'রে। কিন্তু এই চিকিৎসায় মানুষ দেখল বিপদ-মুক্তির চেয়ে বিকৃতি এবং সেই রোগ সমাজদেহে বিস্তার লাভই করেছে, আরোগ্যের সম্ভাবনা দূরান্তরিত হয়ে। তাই আবার এসেছে নতুন নতুন চিন্তাধারা—নতুনতর ব্যবস্থাপত্র, সমাজজীবনকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। এরই মধ্যে চিন্তানায়কেরা দেখালেন যে দুষ্টক্ষতের হাত থেকে রেহাই পাবার পথ রোগনিবৃত্তি, আমূল উচ্ছেদনীতি নয়। কেমন ক'রে সামাজিক-ব্যাধির প্রশমন সম্ভব ও কি করলে সমাজদেহে রোগ-বিস্তারের সম্ভাবনা কমবে এই নিয়ে মনোবিৎ, সমাজবিৎ ও সমাজসংস্কারকেরা আজও গবেষণা করে যাচ্ছেন এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ আবিষ্কার মানব-সমাজের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করছে।

সামাজিক ক্ষত বা ব্যাধির কথাই এতক্ষণ সাধারণ ভাবে বলা হ'ল; কিন্তু এই ব্যাধি বা ক্ষত কি এবং এর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি।

সামাজিক ব্যাধি বা ক্ষত নানারকমের হওয়া সম্ভব, এবং তার কারণও বিভিন্ন। অপরাধ, মানসিক ব্যাধি (mental diseases), যুদ্ধোন্মাদনা, অন্তর্কলহ ইত্যাদিকে সামাজিক ব্যাধি বা ক্ষতের পর্যায়ে ফেলা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে অপরাধ এবং অপরাধীদের বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

অপরাধ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে জানা দরকার অপরাধ আমরা কাকে ব'লে থাকি এবং সেটা কি।

* সহ-মনোবিৎ, আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার।

আইনবিৎদের মতে অপরাধের অর্থ নির্দিষ্ট আইন লঙ্ঘন করা এবং যার জন্য অপরাধীর নির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু সমাজবিৎরা এই সাধারণ সূত্রে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁরা চিন্তা করেছেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপরাধের কোনও বিশেষ সংজ্ঞা পাওয়া যায় কিনা। অপরাধের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অপরাধীদের সমস্ত জীবন-ইতিহাসের সন্ধান নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সাধারণত: অপরাধ এমন একটা প্রবণতা বা বিশেষ মানসিক অসাধারণ অবস্থা যার অন্তর্নিহিত সূত্র আছে সেই মানুষটির মধ্যে—তার শিশুকালের ইতিহাসে এবং তার বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায়। তাঁরা আরও বলেন যে, অপরাধী তার অপরাধ-প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে সাধারণের এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং বলা যেতে পারে যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। অপরাধী যদি অপরাধ নিয়েই জন্মাবে তবে তাদের সংশোধন হয় কি করে? অপরাধকে যদি জন্মগত বা বংশগত প্রবৃত্তি হিসাবেই ধরা যায় তা হলে বাস্তব পরিজ্ঞাত বিষয়াবলীর (evidential data) সঙ্গে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। কারণ মনোবিৎরা বহু অপরাধীর জীবন এবং বংশপরিচয় সন্ধান ক'রে দেখেছেন যে উপরোক্ত মত তাঁদের সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মেলে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে অপরাধ এমন একটা বিশেষ অসাধারণ মানসিক অবস্থা (যা আগেই বলা হয়েছে) যা জন্মগত নয় এবং যা মানুষেরই জীবন-প্রবাহের মধ্যে উদ্ভূত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একপ্রকার ব্যবহারিক বিকৃতি।

সুতরাং অপরাধকে (যা ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনে এক বা একাধিক ঘটনামাত্র) বিশ্লেষণ করতে গেলে অপরাধীর মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। অপরাধী কেন ও কোন অবস্থার মধ্যে অপরাধ করে, সাধারণত: তার মানসিক বৃত্তিগুলোর সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক কি, তার অপরা-বোধের পরিমাণ ইত্যাদি, অপরাধীর মানসিক আবেগ, উদ্বেগ এবং বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ দ্বারা স্থির করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে উপযুক্ত বুদ্ধিহীনতার জন্য লোকে এমন অনেক কাজ ক'রে থাকে যা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয়। এই সব লোকের বুদ্ধির মান সাধারণের চেয়ে অনেক নীচু স্তরের। এদের জড়ধী (idiot), অল্পধী (imbecile) এবং উন্মানস (feeble-minded) বলা হয়। কিন্তু সাধারণত: দেখা গেছে অপরাধীদের মধ্যে এই ধরনের লোকের সংখ্যা কিছু থাকলেও সাধারণ বা উচ্চ-বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং বুদ্ধিহীনতাই যে অপরাধের কারণ নয়, বিভিন্ন সংগৃহীত তথ্যই তার প্রমাণ।

মনোবিৎরা বিশেষ অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আর যে কারণই থাক না কেন আবেগ-প্রবণতা অধিকাংশ অপরাধের মধ্যেই একটা বড় অংশ গ্রহণ করে।

বাস্তবিক অপরাধীদের বর্তমান ব্যবহার এবং তাদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত সত্যের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি বলা হয় যে তাদের আজকের অপরাধের বীজ লুকিয়ে আছে তাদের শিশুকালের গঠনবৈচিত্র্যের মাঝে, তাদের সুখ-দুঃখ ব্যাথা-বেদনা, হাসি-কান্নার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তা হলে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে বহুদিন পূর্বের সেই ব্যথা-ব্যদনা, হাসি-কান্না আদর-আবদারের ইতিহাস আর আজকের এই অপরাধমূলক কার্যকলাপ, এই দুয়ের পার্থক্য তো অনেক, সময়ের ব্যবধানও প্রচুর। কিন্তু ব্যবধান সত্ত্বেও এদের যোগ নেই বললে ভুলই বলা হবে। শিশুকালের "আমি" তো আজকের "আমি"-রই রূপান্তর মাত্র। বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও শিশুকালে শিশুমনের ওপর ছাপ, অভিব্যক্তি ও তার যথাযথ প্রকাশের ওপর নির্ভর করে পরবর্তীকালের ব্যক্তিত্বের গঠনবৈচিত্র্য।

এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য আমাদের এখন দেখা দরকার যে জন্মাবস্থা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিশুর কি ভাবে ক্রমবৃদ্ধি (gradual development) হয়। পরিণত মানুষের পরিণত ভাবাবেগ বা অন্যান্য মানসিকবৃত্তি নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে না। বৃত্তি বা গুণগুলো ধীরে ধীরে তার দৈহিক বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দার্শনিকদের মতে, প্রারম্ভে আমাদের মনকে বলা যায় ঠিক একটা পরিষ্কার স্লেটের মতো, যার ওপর কোনও ধারণার আঁচড় পড়ে নি। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের মন ধারণা সংগ্রহ করে।

শৈশবাবস্থায় শিশুর ব্যবহারিক গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে শিশুর জগৎ তখন আপন দেহের সুবিধা-অসুবিধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শিশু কোনও শারীরিক যাতনায় বা ক্ষিদে পেলে কাঁদে এবং যাতনার উপশম হলে চুপ করে। বাহ্যিক-জগতের কোনও ধারণাই তার মধ্যে তখন থাকে না। দেহের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বয়সও বাড়ে, ক্রমশঃ তার বাহ্যিক জগতের সঙ্গে পরিচয়ও বাড়তে থাকে। বাস্তব-জগতের ঘটনা থেকে তার অভিজ্ঞতার জন্ম হয় এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে ধারণা সংগ্রহ ক'রে এবং সেই ধারণাগুলোকে তুলনা ক'রে আমাদের ধারণার মিল বা অমিল বোঝবার চেষ্টা করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে প্রকৃতি, অর্থাৎ যে পথে এটা চলে মনোবিৎরা তার নাম দিয়েছেন Differentiation এবং Integration। প্রথম দিকে শিশু বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয় সামগ্রিকভাবে, তারপর ধীরে ধীরে এই সামগ্রিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শিশুর উদ্দীপক বিভেদে তার আচরণ প্রভেদ হয়। আবার জায়গামতো এই বিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা অংশবিশেষে ঐক্যীভূত হয়। এইভাবে ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর জন্ম হয়। সুতরাং এটা যখন একটা পদ্ধতি এবং হঠাৎ যখন সাধারণভাবে কোনও ব্যক্তিত্বগুণের জন্ম হয় না, তখন এর উৎপত্তিসময় এবং প্রথমাবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমাবস্থায় কোনও অসুবিধা বা বিকৃতি থাকলে উদ্ভিদ বা যে কোনও জিনিসের মতোই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পরিণত অবস্থায়ও স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়।

শিশুর শৈশবাবস্থার কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে কতকগুলো গোষ্টির (Institutions) প্রভাব শিশুর মানসিক বিকাশের ওপর যথেষ্ট মাত্রায় থাকে। এই গোষ্টিগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে শিশুর পরিবার (family), যার মাঝে শিশু প্রাথমিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির শিক্ষা পেয়ে থাকে। পরিবারের গঠনের ওপর শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভরশীল। শিশু তার পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য লোকেদের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার পেয়ে থাকে বা যে ধরনের ব্যবহার পরিবারস্থ লোকের মধ্যে দেখে, শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারে অনেকখানি তা প্রতিফলিত হয়। সামান্য একটা উদাহরণ থেকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধরা যাক, কোনও একটি পরিবারের জনৈক লোকের মিথ্যাকথা বলা অভ্যাস আছে এবং তা শিশুর কাছেও অপরিজ্ঞাত নয়। এখন শিশু যা দেখে বা শোনে তাই শেখবার চেষ্টা করে এবং এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই বা একটু মজা পাবার জন্য তার মা অথবা বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলল। এই মিথ্যা বলার জন্য তার মা অথবা বাবা তাকে শাসন করলে শিশু স্বভাবতই অনুযোগের সুরে বলে, "বারে, ও যখন মিথ্যা বলে তোমার কাছে তখন তো তুমি ওকে মারো না—খালি আমার বেলায় তো মার আর বকুনি। তুমি ওকে খুব ভালবাস কিনা, আর আমায় একটুও ভালবাস না"।

ওপরের এই উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শিশু পরিবারের লোকেদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে এবং এতে কোনও বাধা পেলে তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করে তা ব্যাখ্যা করবার। সে নিজের মনে একটা ধারণা ক'রে নেয় যে তার প্রতি এই অবিচারের কারণ হ'ল যে তাকে তার অভিভাবকরা

দেখতে পারে না বা ভালবাসে না। এই ধারণা পরবর্তী কালে যদি মানসিক-আঘাত হিসাবে মনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে থাকে তবে তা সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। প্রত্যেক পিতামাতারই উচিৎ অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী প্রকৃত কথা না এড়িয়ে গিয়ে বা অযথা রাগ না ক'রে, শিশুকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলা। শিশুকে যদি অবস্থার আপেক্ষিক গুরুত্ব তার মতো ক'রে বুঝিয়ে বলা যায় তা হলে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী কোনও অবস্থার উৎপত্তি তার মনে হতে পারে না। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে যে ব্যবহারিক বৈষম্য-মূলক রীতিনীতি, বিশেষ ক'রে পিতামাতার দিক থেকে শিশুদের প্রতি ব্যবহারিক বৈষম্য—তা যে ধরনের ব্যবহারই হ'ক না কেন—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

অপরাধীদের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে যে অধিকাংশ অপরাধীই শিশুকালে তাদের পারিবারিক অভিভাবকদের কাছ থেকে সুস্থ ব্যবহার পায় নি। হয় তারা বাড়িতে অত্যন্ত অনাদরে পালিত হ'ত আর নয় তাদের অভিভাবকদের কাছে 'লদুপাপে' বা বিনা দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অথবা অভিভাবকদের কেউ কেউ তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিত, আবার অন্য কেউ (সেই পরিবারের) এই নিয়ে শিশুর সামনেই শাস্তিদাতার সঙ্গে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করত। তবে শুধু এই-ই নয়, অপরাধীদের মধ্যে অত্যধিক আদর পেয়ে 'বিগড়ে' যাবার কাহিনীও অনেক আছে।

যাই হ'ক দেখা যাচ্ছে, শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে প্রথম বাধা আসে শিশুরই একান্ত আপন-জনের কাছ থেকে। শৈশবাবস্থায় প্রত্যেক শিশুরই ইচ্ছা থাকে তার বাবা-মা'র মর্তো হবার এবং এই ইচ্ছার প্রকাশ আমরা দেখি শিশুর খেলা-ধুলা, কথা-বার্তা আর কাজ-কর্মের মধ্যে। এখন এই অবস্থায় শিশু যদি তার অভিভাবকদের কাছে বা তার পরিবারের লোকজনের কাছে এমন ব্যবহার পায় যা তার মানসিক-জগতে বিক্ষেপ-সৃষ্টির অনুকূল, তবে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হওয়া অসম্ভব নয়। যে-আবেগ নিয়ে সে তার বাবা অথবা মা'কে নিজের ব'লে দেখে এবং তাদের জায়গায় নিজেকে বসায়, সেই আবেগগুন্থিটি তার এই মানসিক অশান্তির ফলে নষ্ট হয়ে যায় বা তার স্বাভাবিক সুর হারিয়ে ফেলে। এখন শিশুর মনে অশান্তির ফলে এই যে অস্বাভাবিক বা বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব-জগতের সংস্পর্শে আসার দরুণ তা ক্রমশই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বাস্তব-জগতের সঙ্গে সে নিজের একাত্মীকরণ (identification) করতে পারে না, তাই বাস্তব-জগতের দাবিও সে ঠিক মতো মেটাতে পারে না। তার মনোজগতের ধারণা তার অসম পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যা সুস্থ সামাজিক জীবনের একটা বড় প্রতিবন্ধক। সত্যিকার বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ অল্প। বাস্তবজগতের সঙ্গে এই অমিল মনে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে তার মানসিক এবং নৈতিক শক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না, বা হীনবল হয়ে যায়। অনেক বিশিষ্ট মনোবিৎ-এর মতে অসামাজিক কাজ বা অপরাধের কারণ হ'ল এই মানসিক এবং নৈতিক শক্তির অপরিপূর্ণতা।

তবে এ-কথা একবাক্যে বলা বর্তমান অবস্থায় কঠিন যে সমস্ত অপরাধীই তাদের শৈশবজীবনে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বা বিকৃত এবং অসামাজিক পরিবেশে বড় হয়েছে। পাশ্চাত্য-জগতের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দেশে আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যাদের শৈশবজীবন সুসম এবং সুসংবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা বিপথগামী হয়েছে। সুতরাং পারিবারিক বিশৃঙ্খলাই যে অপরাধের মূল কারণ তা আজকে জোর ক'রে বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে পারিবারিক সুসমতাই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত কাম্য এবং অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সুস্থ এবং স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-

(শেষাংশ ১৯ পৃষ্ঠায়)

রোগযন্ত্রণার মনস্তত্ত্ব

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.বি.বি.এস., ডি.ফিল্.*

শিরোনামা দেখেই প্রশ্ন ক'রে বসবেন না যেন, রোগ থাকলেই যন্ত্রণা হবে আর সেইজন্যই তো আমরা ডাক্তার-বৈদ্য ডাকি, সুতরাং তার আবার মনস্তত্ত্ব কি? শ্রদ্ধেয় পাঠক ধৈর্য ধরুন—অত সহজে উতলা হবেন না। এই তো সেদিনের কথা। কোনও হাসপাতালের "এমার্জেন্সি রুম।" দেখাতে এসেছেন এক তাগড়া জোয়ান। সামান্য একটু কেটে গেছে। বিশেষ কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। একটু বেন্‌জিন্ লাগিয়ে ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন্ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল। একটু পরেই হুলুস্থুল। লোকটি ইন্‌জেক্‌শনের ছুঁচ বেঁধানোর সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। দেখুন কাণ্ড! যাক, আরও কিছু ওষুধ খাইয়ে চাঙ্গা করা হ'ল লোকটিকে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলল—সে কোনও দিন শরীরে ছুঁচ বেঁধায় নি, সেইজন্য যদি যন্ত্রণা হয় এই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সত্যি লেগেছিল কিনা তা ঠিক তার খেয়াল নেই, শুধু ভয়েই এত কাণ্ড। একটু পরের ঘটনা। এক এ্যাম্বুলেন্স থামল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন চালক। বললেন রেলে কাটা পড়েছে, ইমার্জেন্সি স্লিপ্ দিন। রোগীকে একবার দেখবার জন্যে গাড়ির ভিতরেই যাওয়া হ'ল। কী বীভৎস দৃশ্য। হাঁটুর ওপরে দুটো পা-ই একবারে সমান্তরাল ভাবে কাটা পড়েছে। পা-দুটোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে গাড়িতে। লোকটি আধা-বয়সী, বেশ সজ্ঞান। নাম-ধাম এবং কি ক'রে রেলে কাটা পড়ল তারও একটি বিবরণ দেওয়া হ'ল। আমরা যন্ত্রণা কমাবার একটি ওষুধ দিয়ে তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ড-এ পাঠিয়ে দিলাম। লোকটির নাড়ী পর্যন্ত হাতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র ছিল না। এক ঘণ্টা পরে মারা গেল। এখন বলুন তো, কার যন্ত্রণা বেশী ছিল? অবশ্য আপনি যদি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী হন তবে জড়ভরতের উদাহরণ দিয়ে বলবেন—আত্মা অজর, অমর; কোনও ক্লেশই তাকে কাবু করতে পারে না, কোনও বেদনাই তাকে পীড়িত করতে পারে না। অনেকেই এ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক খাড়া করবেন। সেদিন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়ছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথের নাকি একবার অস্ত্রোপচার হয়। সকলে উৎকণ্ঠিত। ভাল হবার পর জিজ্ঞাসা করা হ'ল—খুব কষ্ট হয়েছিল তো? কবি স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন "না হে, কষ্টের কথা একবারে ভাবিই নি যে টের পাব"। অবশ্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমশাই কবির অভিজ্ঞতাটি নিজের বেলায় খাটাবার চেষ্টা করেছিলেন একবার হাসপাতালে থাকা কালে। কিন্তু তাঁর বেলাতে হয়েছিল ব্যতিক্রম—অর্থাৎ যন্ত্রণা কমার চেয়ে যেন বেড়েই গিয়েছিল।

আর একটি গল্প শুনেছিলাম এক অধ্যাপকের কাছে। ঘটনাটা ঘটেছিল তাঁদের গ্রামে। বিলের ধারে কাঁকড়ার গর্ত থাকে। গ্রামের লোকে ঐ কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরে। একবার একটি লোক ঐ ভাবে অনেক কাঁকড়া ধ'রে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় আসতে আসতে দেখা হ'ল ঐ শ্রেণীর আরও একটি লোকের সঙ্গে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলে?" প্রথম লোকটি জায়গার নির্দেশ দিল। শুনেই দ্বিতীয় লোকটি বলল "করেছ কি! ওখানেই এইমাত্র দেখে এলুম বেদেরা একজোড়া কেউটে সাপ ধ'রে নিয়ে এল।" প্রথম লোকটির অবশ্য মাঝরাস্তায় দেরী হয়েছিল—সে আর এক কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল। দ্বিতীয় লোকটির কথা শুনে সে খুবই ঘাবড়ে গেল। সেদিন কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কাঁকড়ার দাড়ায় ওর একটি আঙুল কেটে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে সে খুব মুষড়ে পড়ল। সকালবেলায় দেখা গেল তার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা—সর্বাঙ্গ নীল। লোকটি শেষপর্যন্ত মারা গেল। কিন্তু একটা সন্দেহ থেকে গেল। সাপটা সেদিন ধরা হয় নি—দ্বিতীয় লোকটি ভয় দেখাবার জন্য ভুল বলেছিল—ধরা পড়েছিল তার দুদিন আগে। আর একটা কথা—সাপ থাকলে সে গর্তে কাঁকড়া থাকে না। প্রথম লোকটি দাড়ায়-আটকানো-আঙুল নিয়েই কাঁকড়াটাকে গর্ত থেকে ওপরে তুলেছিল। সুতরাং সাপে কামড়ানোর কথা নয়। তবু লোকটি সাপে কামড়ানোর যন্ত্রণা ভোগ ক'রেই মারা গেল।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকাতে। সেখানে এক ভদ্রমহিলা প্রথম সন্তানসম্ভবা হয়ে তীব্রণ বমি করতে শুরু করেন। সে আর কিছুতেই থামে না। যা খান তাই বমি হয়ে উঠে যায়। অবশেষে ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হ'ল। সেখানে একটু একটু করে বমি করতে লাগলেন। তাঁর স্বামী রোজ দেখতে আসেন। মহিলাটি সেরে উঠতে লাগলেন। কিন্তু আর এক বিপত্তি দেখা দিল। স্বামী বেচারা বউ-এর কষ্ট দেখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রথম গা-বমি করতে আরম্ভ করল; পরে তিনিও বমি করতে শুরু করলেন। অবশেষে তাঁকেও ঐ হাসপাতালের পুরুষ-বিভাগে ভর্তি করা হ'ল। মহিলাটি ভাল হয়ে ছাড়া পেলেন—স্বামীকে দেখতে আসেন রোজ। স্বামী বেচারা কিন্তু ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যেতে লাগলেন। অবশেষে প্রিয়তমাকে ছেড়ে পৃথিবী ছেড়েই চ'লে গেলেন। এখন এই যে অসুখটি স্বামী বেচারার হ'ল তা কিন্তু সন্তানসম্ভবা স্ত্রীদেরই একচেটিয়া। সুতরাং স্বামী-ভদ্রলোকটি কি ক'রে ঐ রোগে আক্রান্ত হলেন? কিন্তু প্রশ্ন নিয়েই তো লেখা আরম্ভ—উত্তর দিয়ে নয়। কাজেই কার্যকারণ সম্বন্ধ নিয়ে গবেষণা করে এখানে লাভ নেই। তবে যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম তা থেকে এটা ধরতে পারবেন যে রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে মনের বেশ কিছু সম্পর্ক আছে।

*কলিকাতা নিলরতন সরকার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগ।

অপরাধ—সামাজিক ব্যাধি

(১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিকাশের বিশেষ পরিপন্থী।

সুতরাং সমস্ত সমাজের কথা বাদ দিলেও শুধু শিশুর ভবিষ্যৎ এবং অভিভাবকজনের ব্যক্তিস্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে, পরিবারস্থ লোকজনের, বিশেষতঃ প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য তাঁদের সন্তানের দৈহিক স্বাস্থ্যের মতো তাদের মানসিক স্বাস্থ্যমানের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে সে বিপথগামী না হতে পারে। এ-কথা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য মনে রাখা উচিৎ যে সুস্থ ব্যবহার এবং ঠিকমতো লক্ষ্য রাখলে শিশুদের মনোজগতে দুষ্কৃতির বীজ বাসা বাঁধতে পারে না বরং তার প্রতিরোধ শক্তির সঞ্চার করে।

শিশুর প্রশ্ন

তরুণচন্দ্র সিংহ. ডি.এস্‌সি.*

অতীতের কোন্ যুগে মানুষ প্রথম কি, কে, কেন, কবে, কাহার, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছিল আজ তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সেই বিস্মৃত অতীত হইতে মানুষের সেই প্রশ্ন আজও চলিয়া আসিতেছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের অনুসন্ধিৎসু এই মনের চিরন্তন প্রশ্নের জবাব আজও মিলিল না। তবু চিরজিজ্ঞাসু মানবমনের বিরাম নাই। সে যুগে যুগে সর্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে আর অবিরাম সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসরের এই পৃথিবীতে কয়েক সহস্র বৎসর পুর্বে কেবল এই ভারত-বর্ষেই এক সময় শক্তিমানের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল "জানি আমি জানি, তমিস্রার অন্তরালে সেই জ্যোতির্ময় মহানকে আমি জানি''। জগতে আর কোনওখানে এমন কথা কেহ বলিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু মানুষমাত্রেই সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে নাই এবং সে মহাজ্ঞান আবার কি ভাবে তমসার আবরণে ঢাকা পড়িয়া গেল ইতিহাস তাহা লেখে না। তবু প্রশ্নটুকু আজও বাঁচিয়া আছে।

প্রাণ ধর্মে আছে বেগ, মনোধর্মে আছে বাসনা এবং তৎপুরনের জন্য ইচ্ছা এবং জিজ্ঞাসা। বস্তুজগতে প্রাণ যে চাঞ্চল্য আনিয়াছে মন তাহার সঙ্গে কামনা, প্রশ্ন, সৃজন ইত্যাদি যুক্ত করিয়া বিচিত্র লীলা গড়িয়া তুলিয়াছে। বিস্মৃত অতীত হইতে কতভাবে কতরূপে বস্তুর সঙ্গে মনের এই মিলন লীলা চলিয়া আসিতেছে। মনে হয় তাহার আদি নাই, অন্ত নাই।

বাক্য উচ্চারণ করিবার পুর্বে শিশু নানাপ্রকারের শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে। গলার শব্দের সঙ্গে জিহ্বা ও মুখের অন্যান্য পেশী এবং ঠোঁটের সহ-যোগিতায় একদিন হঠাৎ প্রশ্নের রূপে উচ্চারিত হয় "কি ?'' স্নেহমুগ্ধ জননী এই শব্দটিকে যেন আবার নুতন করিয়া শোনেন, জানেন, যেন নুতন একটা অর্থও কিছু বুঝিতে পারেন। শতবার এই প্রশ্নই তিনিও করিতে থাকেন—'কি'? 'এটা কি ?' 'ওটা কি ?' শিশু উৎসাহিত হইয়া ক্রমে প্রশ্নের ক্ষেত্র নিজেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় বাহিরের পরিবেশের আলো, বাতাস, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও অবস্থাগুলির সঙ্গে শিশু অত্যন্ত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভোগের সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য সেসব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও নানারকমের চেষ্টা করিতে থাকে। ক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্টতর ইচ্ছা জাগে। এই ইচ্ছার প্রকাশ নূতন প্রশ্নে ও জীবনের নানাক্ষেত্রে পরে প্রসার লাভ করিতে থাকে। সকল ক্ষেত্রেই ইচ্ছার সহজ প্রকাশ সম্ভব হয় না, এ অভিজ্ঞতাও শিশু নিজের জীবন হইতেই লাভ করে। তখন আবার নুতন প্রশ্ন জাগে নুতন পথের সন্ধানে সাধ্যমত সে নানা জটিল পথে ইচ্ছা-পুরণের চেষ্টা করে। সে চেষ্টাও যেমন সকল সময়ে তাহার সংজ্ঞান বিচারের নিয়ম মানিয়া চলে না মনের প্রশ্নও তেমনই সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয় না। সে আলোচনা এখানে করিব না। প্রথম অবস্থায় শিশু তাহার বিস্ময় ও আগ্রহ যে-সব শব্দ ও অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা ব্যক্ত করে, জননীর উল্লিখিত শিশুপ্রশ্নের পুনরুল্লেখে তাহা প্রবলতর হয় ও শিশু অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠে। কিন্তু তখনও তাহার প্রশ্ন

*ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির সচীব ও লুম্বিনি পার্ক মানসিক রোগের হাসপাতালের অধীক্ষক।

সব সময় বুঝিতে পারা যায় না। কিছুদিন পরেই বুঝা যায় শিশু আর তাহার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি শুনিয়া ও উপরি-পাওয়া জননীর ভালবাসাটুকুতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সে যেন সত্যই তাহার প্রশ্নের উত্তর চায়, জানিতে চায়, বুঝিতে চায়। চারি পাশের জগতের সঙ্গে যেন সে তাহার সাধ্যমত জানা বুঝার সঙ্গে শিশুসুলভ কল্পনা মিশাইয়া সম্বন্ধ গড়িতে চায়। কিছু একটা না বুঝিতে পারিলে তৃপ্ত হয় না। কিন্তু শিশু তবু শিশুই। কতটুকুই বা সে বুঝিতে পারে। তাহার মনের ও অভিজ্ঞতার অপরিনত অসহায় অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ অভিভাবক, শিক্ষক প্রভৃতি তাহাদের প্রতি কত অন্যায় অবিচার করেন ও তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর কত দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করেন সে খবর হয়ত তাঁহারা নিজেরাই রাখেন না। না জানিয়া যে ক্ষতি তাঁহারা করেন সেজন্য তাঁহাদের দোষ দিলে ভুল করা হইবে। শিশুকে তাঁহারা ভালবাসেন না বা তাহাদের কল্যাণ চাহেন না এমন নহে। যে কোনও সুস্থ মানুষ, মানুষের কল্যাণ চাহে, নিজ সন্তানের সম্বন্ধে ত প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু শিশুর মন যাহা দেখে, যাহা সে ভাবে, কল্পনা করে, অন্যের আদেশ-নির্দেশ যাহা শোনে তাহা হইতে কেবলই সে প্রশ্ন করে—কি, কেন, কে, ইত্যাদি। নিজ ক্ষমতানুসারে কিছু একটা না বুঝিলে তাহার মন মানে না। কিন্তু তাহার অবিরাম এই প্রশ্নের উত্তর পিতা-মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই সকল সময় দেন না। অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভবও নহে। বয়সে বড় হইলেও সংসার-অভিজ্ঞ বলিয়া আত্মাভিমান থাকিলেও আমরা সত্য তথ্য কতটুকু জানি ? যাহাও বা কিছু জানি শিশুকে বুঝাইবার মত শক্তি অনেকেরই নাই। তাহাদের বোধগম্য ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ শিশুর মন আমরা বুঝি না। আমরা প্রত্যেকেই শিশু ছিলাম। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন সকলেরই হয়, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে যে চিরন্তন শিশুভাবটি থাকিয়া যায় ইহা স্বীকার করিতেও যেন আপত্তি দেখা যায়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুমনের গলা টিপিয়া মারাটাই যেন বড় হওয়ার সোপান বলিয়া মনে করি। কেবল তাহাই নহে, আত্মমোহ আমাদের অন্ধ করে। শিশুর মনকে আমরা বহুলাংশে অবহেলা করি। এই পৃথিবীর বহুর মধ্যে নবাগত শিশুর যে জানিবার বুঝিবার পিপাসা তাহার বহু প্রশ্নে সে প্রকাশ করে, সে-সব প্রশ্নের মর্যাদা আমরা দিতে পারি না বলিয়া তাহার সে প্রশ্ন উত্তর না পাইয়া নিজের মনে ঘুরিয়া মরে, মনগড়া যাহা হউক কিছু একটা ব্যাখ্যা করিয়া নিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। মানুষের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের এক একটা জীবনের ক্ষেত্র আছে। সংসারের নানা দাবীতে ঘেরা এই জীবনক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নানা কাজ-কর্ম ও চিন্তার প্রয়োজন আছে। মা যখন সংসার কর্মে ব্যস্ত, শিশু এটা-সেটা কবল প্রশ্ন করিতে থাকিলে তাহার মনের ক্ষুধা তখন মিটাইবে কে ? যে প্রকৃত শিশুকে ভালবাসে তাহার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব নহে। শিশুর প্রশ্নের তখন উত্তর দিবার অবসর না থাকিলেও, তাহাকে স্নেহকণ্ঠে হাতের কাজ শেষ করিয়া পরে তাহার প্রশ্নের উত্তর বুঝাইয়া দিবেন এ আশ্বাস দিলে এবং পরে তাহা বুঝাইয়া দিলে শিশু তৃপ্ত হয়। কেবল তাহাই নহে, ক্রমে সে বুঝিতে পারে বড়দের বিশেষ কাজের সময় তাহাদের বাধা দিলে তাহাদের অসুবিধা হয়। সেও, প্রশ্ন তখন করিলেও, উত্তর পরে শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের নিজেদের দুর্বলতার জন্য, আমরা মেজাজ খারাপ করি বিরক্তির স্বরে রূঢ় উত্তর দেই এমন কি বার বার বিরক্ত করিবার জন্য শিশুকে শাসনও করিয়া বসি। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতেও কোনও কোনও শিক্ষক এইরূপ আচরণ করেন। ছাত্রর মনে যে প্রশ্ন ওঠে তাহার উত্তর না দিয়া

বা দুই একবার উত্তর দিলেও ছাত্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিলে অযথা শাসন করা হয়। উপযুক্তভাবে বুঝাইয়া দিবার দায়ীত্ব শিক্ষকের। কোন্ ছাত্রকে কি ভাবে বুঝাইলে সে বিষয়টি বুঝিতে পারিবে সেইদিকে চেষ্টিত না হইয়া অন্যায়ভাবে ছাত্রকেই শাসন করেন। শিক্ষকতার যোগ্যতা সকলের থাকে না। এই যোগ্যতার দিকে নজর দিবারও সময় হইয়াছে। এরূপ অসঙ্গত শাসনের ফলে যে অন্তহীন প্রশ্ন মানুষকে সর্বদা সত্যের সন্ধানে উৎসাহী করিয়া তুলে, শিশুর মনের সে উৎসাহ আমরাই নষ্ট করিয়া দেই। ইহার পরিণাম যে শুভ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। শিশুকে যথেষ্ট প্রশ্ন করিতে উৎসাহিত করিলে তাহার মন সহজভাবে চারিদিকে দেখিতে শিখে, বুঝিতে চাহে, আরও জানিতে চাহে। জ্ঞানলাভের ইহাই সোপান।

আর একটি বড় রকমের বাধা দেখা দেয় আমাদের নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা। শিশু তাহার সহজ মন নিয়াই এমন অনেক প্রশ্ন করে যাহা আমরা নীতি গর্হিত মনে করি। এমন অনেক মত প্রকাশ করে যাহা আমরা অন্যায়, দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করি। তখন শিশুকে সে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করা হয়। পুনরুক্তি করিলে শাসন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করা হয়। কিন্তু মুখ থামিলেও মন থামে না, এ সহজ কথাটা আমরা ভাবিয়া দেখিনা। ধর্ম সম্বন্ধেও এই একই কথা। শিশুর মনে নীতি ধর্ম এসব বোধ কিন্তু তেমনভাবে থাকে না। যাহা মনে আসে সে বলে। তাহার সে প্রশ্ন চাপিতে চেষ্টা করার শুভ ফল হয় না। শিশু যতটুকু বুঝিতে পারে তাহাকে ততটুকু বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। লজ্জা করিলেই লজ্জা বাড়ে। সেই সঙ্গে বিকৃত ঔৎসুক্যও বাড়ে। শিশু অন্যের কথা হইতে ইঙ্গিতে যাহা বুঝিয়া নেয় তাহা হইতেও বুঝিতে পারে পিতা মাতা বা শিক্ষক যাহাদের উপর সে বিশ্বাস করিয়া চলে তাঁহারও তাহাকে অনেক কথা গোপন করেন। ফলে তাহার সে বহুমূল্য বিশ্বাসে ফাটল ধরে, শিশুর স্বভাবেও নির্ভরতার অভাব জনিত অনিরাপত্তার উৎকণ্ঠা ধীরে ধীরে দেখা দেয়। এই উৎকণ্ঠা কোন কোন ক্ষেত্রে আতঙ্কে পরিণত হইয়া মানসিক রোগ লক্ষণে প্রকাশ পায়। সাধারণ বা সামান্য, বলিয়া আমরা যাহা মনে করি মনের গভীর স্তরে তাহাই অসামান্য মূল্য নিয়া লুকাইয়া আছে। সেই আপাতঃ সামান্যমূল্য মনের কামনা বাসনা সম্বন্ধে সচেতন হইবার, সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞান যাহা জানিতে পারিয়াছে জীবনে তাহার প্রয়োগ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। জীবনের কত সমস্যার তাহা হইলে যে কত সহজে সমাধান হইতে পারে, জীবনের গতি শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া সৃজনধর্মী হইতে পারে।

শিশুর যৌন বিষয় সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ অন্য বিষয়ের মতই প্রবল। এমন কি এ সম্বন্ধে স্বাভাবিক গোপনতা রক্ষা করার ফলে শিশুর এ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মাত্রায় বাড়িয়া যায়। ফলে নানা যৌন বিকার ও মানসিক বিকারও দেখা দেয়। এই অসামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের অকল্যাণকর পরিণতি প্রায়ই সন্তু সন্তু দেখা দেয় না বলিয়া সাধারণতঃ আমরা এই সব বিকার ঐ বিকৃত জ্ঞান বা স্বভাবপীড়নের ফল বলিয়া বুঝিতে পারি না। আধুনিক মনোবিদ্যার চর্চায় এ সম্বন্ধে যে সত্য জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে অসুস্থ যৌন মানসিকতাই বহু মানসিক রোগ, নানা প্রকার ব্যভিচার, অপরাধ, প্রবণতা ইত্যাদির মূল কারণ বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় শিশুর প্রশ্নের উত্তর যেমন সহানুভূতির সঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন শিশুর যৌন প্রশ্নেরও উত্তর তেমনই সহজভাবে সহানুভূতি সহকারে শিশুর বোধগম্য ভাষায় দেওয়া উচিত। যৌন জ্ঞানও জ্ঞান। সত্য-ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হয়। অবস্থানুসারে অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া এই সত্য পরিবেশন করিতে হয়। বয়স্কদের পক্ষে যে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব শিশুর পক্ষে অনেক বিষয় তাহা সম্ভব নহে। শিশু যতটুকু বুঝিতে পারে তত-টুকুই তাহাকে প্রশ্নের উত্তরে বা কোনও বিষয় বুঝাইতে বলা উচিত। সে বিষয় আরও তথ্য যে জানিবার আছে, ক্রমে বড় হইলে সে তাহা জানিতে পারিবে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিশু প্রশ্ন করিলে তাহাকে অবহেলা বা শাসন করিলে তাহার ফল শুভ হয় না। সে জানিতে বুঝিতে চায় বলিয়াই প্রশ্ন করে। তাহার বিশ্বাস পিতামাতা তথা বয়স্ক সকলেই সত্যজানে এবং তাহার যাহা জানিবার তাহা তাহাকে বুঝাইয়া জানাইয়া দিতে পারে। ক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিতে পারে তাহার সে ধারনা সত্য নহে। ইহা তবু ভাল। তাহার ভুল ভাঙা ভাল। মানুষ সর্বজ্ঞ নহে ইহা তাহাকে বুঝিতে দেওয়া ভাল। কিন্তু তাহার জানিবার বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও তাহার একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের পাত্র পাত্রী যদি তাহার প্রশ্নের সদুত্তর না দিয়া সত্য গোপন করে বা তাহাকে অবজ্ঞা বা শাসন করে শিশু তাহাদের সে ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করা দূরে থাকুক, অন্যায় বা প্রবঞ্চনা বলিয়া মনে করে। শিশু ইহা সহজভাবে মানিয়া নিতে পারে না। বয়স্কদের বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুব্ধ মনোভাব ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া কখনও কখনও ঈর্ষাণী মেঘের মতো ভীষণ রূপ নিতে পারে, আবার কালবৈশাখীর মতো রুদ্র বেগে ভাঙিয়া পড়িয়া পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সমাজকে বিশৃঙ্খল ও লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে পারে। সমাজে এমন উদাহরণের অভাব নাই। বিশ্বাসের ভিত্তি ভাঙিয়া গেলে শিশু অপরের সম্বন্ধে দয়ামায়াহীন অসামাজিক ও অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতে পারে। আঘাত বিচারে যাহা সামান্য, শিশুর আবেগপ্রবণ মনে তাহাও প্রবল ঝড়ের সূচনা করিতে পারে। পিতামাতা বা তৎস্থানীয়-দের সঙ্গে শিশুর যে যোগসূত্র ক্রমে গড়িয়া ওঠে হঠাৎ তাহা ছিন্ন হইলে মানসিক আন্দোলন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, এবং নিজেকে অসহায় বোধ করিতে পারে। অন্য মানসিক রোগ বা বিকৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সে-সব মানসিক রোগ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

যতটুকু জানা আছে ততটুকুই উপযুক্ত ক্ষেত্রে বলা দরকার। যাহা জানি না সে সম্বন্ধে শিশুর কাছে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ নাই। আত্ম-অহংকারকে বড় করিয়া সর্বজ্ঞ ভাব প্রকাশ করা বা নিজে যাহা জানি তাহাই একমাত্র সত্য জোর গলায় তাহা শিশুর মনে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা অশুভ। শিশু বড়দের জ্ঞানের সীমা নিজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বুঝিতে পারে। তাহাকে মিথ্যার জালে ভুলাইয়া রাখা যায় না। যে আত্মসম্মান হারাইবার ভয়ে বয়স্করা শিশুদের কাছে নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকিতে সর্বজ্ঞ বা প্রধান বলিয়া জাহির করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহাদের সেই চেষ্টার অন্তরালের দুর্বলতা শিশুর নিকট ধরা পড়িয়া যায়। ফলে যে অহমিকার ভুলিয়া শিশুর নিকট তাঁহারা সম্মান ও মর্যাদা পাইতে চাহেন সেই সম্মান-মর্যাদাই তাঁহাদের ক্ষুণ্ন হয়। পিতামাতা প্রভৃতিদের পক্ষে ইহাও কম ক্ষতি নহে। শিশু বড় হইয়া পিতামাতাকে সম্মান করে না বলিয়া যে অনুযোগ প্রায়ই শোনা যায়, তাহার বীজ যে তাঁহারা নিজেরাই বপন করেন এ-কথা অনেকেই জানেন না। মানুষ অনেক পরিমাণে নিজের ভাগ্য নিজের অজ্ঞাতে এমনই করিয়া রচনা করে, কিন্তু দায়ী করে অপরকে।

নিজে যে-প্রশ্নের উত্তর জানেন না সে-সম্বন্ধে জানিয়া উত্তর দিবেন শিশুকে স্পষ্ট কথায় তাহা বলা উচিত। তাহাতে শিশু আপনাকে আরও বেশী বিশ্বাস করিবে। এ-কথা কেবল শিশু নহে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য।

আমাদের আরও এক রিপু আছে। নিজে যাহা জানি তাহাই একমাত্র সত্য মনে করিয়া অপরের মতামত সম্বন্ধে নিন্দা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করি। আমাদের এই মনঃপ্রকৃতির প্রভাব শিশুমনেও রেখাপাত

করে। শিশু একই বিষয় অনেকের নিকট প্রশ্ন করিয়া অনেক রকমের উত্তর শুনিতে পারে। সে ঐ বিষয় সম্বন্ধে কি মনে করে বা কি শুনিয়াছে এবং সর্বোপরি ঐ বিষয় সম্বন্ধে তাহার প্রশ্নের উত্তর কি হইতে পারে বলিয়া সে অনুমান করে তাহা শিশুর নিকট হইতে প্রথম জানিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহার কথা শুনিয়া পরে যথাযোগ্য উত্তর দিয়া সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া কোন মতের কোথায় কি ভুল তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য বয়স খুব কম হইলে ইহা সম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে সামান্য ভাবে তাহাকে সত্যটুকু বুঝাইয়া দিতে হইবে।

মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাইতে পারিলে, প্রশ্নের উত্তর ক্রমে ক্রমে পাইতে সে নিজেই চেষ্টা করিবে। প্রশ্ন না থাকিলে উন্নতি বা জ্ঞান কোনটাই সম্ভব নহে। প্রশ্ন না জাগিলে সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছাও জাগিবে না। জানিতে চাই বলিয়াই প্রশ্ন করি। মানুষ নিজেকেও নিজে প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের উত্তর নিজের মধ্যেই খোঁজে, অপরের সাহায্য নেয়। ইহাতেই জীবনের, সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। শিশুকাল হইতে এই প্রশ্নের যদি কণ্ঠরোধ করা হয় তবে মানবের অগ্রগতির মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। শিশুকে প্রশ্ন করিতে উৎসাহিত করা যেমন দরকার, প্রশ্ন করিয়া তাহার মনকে উত্তরের অন্বেষণে সন্ধানী করিয়া গড়িয়া তোলাও তেমনই হিতকর। অন্তরের এই জিজ্ঞাসাই মানুষকে উন্নতির ও সৃষ্টির পথ দেখাইয়াছে—সত্যের সন্ধান দিয়াছে। মানুষ চিত্র, ভাস্কর্য, কাব্যসঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে অন্তরের এক মহান প্রশ্নের উত্তর দিতে। আবার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেই বিজ্ঞান ও দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং চরম প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে পরমের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। সহস্র বাধার মধ্যেও মানব মনের প্রশ্ন উত্তরের আশায় আজও তাহাকে সম্মুখের দিগন্তরালের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিতেছে।

অরুণোদয়

অনাদিনাথ ঘোষাল, এম.বি.বি.এস., এম এ. *

অতীশ আর তার সংসারের দিকে তাকাতে পারে না। সুখ যে কি তার স্বাদ বোধ করি এই আঠার বৎসরের বিবাহিত জীবনে একবারও পায় নি। আজ চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তার চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তার মনের অবস্থা। স্ত্রী তুহিনা তাকে একদিনের জন্যও সুখী করতে পারল না। সর্বদা একটা খিটমিট লেগেই আছে। সব সময়ই মন-কষাকষি—সাপে-নেউলের বাড়া অবস্থা।

অথচ তার কী না হতে পারত। বনশ্রী তাকে কি ভালই না বাসত। বনশ্রীর কথা মনে পড়লে অতীশ ফিরে যায় তার চব্বিশ বৎসর আগের জীবনে। তখন সবে সে ম্যাট্রিক পাস করেছে। জেলার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র শ্রীমান অতীশকুমার রায়। কলকাতায় পড়াশুনা করবার জন্য সবচেয়ে নামজাদা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হ'ল। তখন তার প্রাণে ও মনে উল্লাস, তাকে দশজনের মধ্যে একজন হতে হবে, শুধুমাত্র কলেজে প্রথম হওয়াটাই তো জীবনের লক্ষ্য নয়। সব ভুলে সারাদিন পড়াশুনা করতে লাগল। বিজ্ঞানের অজস্র প্রক্রিয়া দেখতে লাগল—যেগুলি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ব'লে তার মনে হ'ত—তাদের আজ পর্যন্ত কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। অতীশ এইরকম অনেক কিছুরই অসঙ্গতি দেখে তাদের কারণ জানবার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করতে লাগল—যদি কোনও বৈজ্ঞানিক সে সকল সম্বন্ধে কিছু ব'লে থাকেন। ক্লাসে বক্তৃতার শেষে প্রতিদিনই শিক্ষকের সঙ্গে তর্ক লেগেই থাকে। অনেক শিক্ষকই তাকে এই বিষয়ে অনুপ্রেরিত করতেন, কেউ নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করতেন, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ তাকে পড়াতে পড়াতে একদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন, "দেখ অতীশ, এখন পাস করতে হবে। যা বলছি তা মন দিয়ে শোন; বুঝতে না পার মুখস্থ কর। এখন যা অসঙ্গত বোধ হচ্ছে, আরও কিছুদূর যাবার পর তার সন্তোষ-জনক মীমাংসা আপনিই করতে পারবে। যেগুলি না পারবে তার মীমাংসার জন্য পরে যথেষ্ট সুযোগ পাবে, যদি ভালভাবে পাস করতে পার। আমার মনে হয় পাঠ্যপুস্তক ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম না ক'রে অন্য কিছুর দিকে মাথা ঘামানো অবান্তর। সেটা উপস্থিত কষ্টদায়ক মনে হলেও আমাদের ধৈর্য ধরতেই হবে। তবে আমি বলছি না বইএর প্রতিটি তথ্যই বেদবাক্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে। বইকে স্বীকার করে নিজের মনে মনে একটি অনুমান করে নিতে হবে এবং দেখে যেতে হবে সেটি উপস্থিত ব্যাখ্যা বা সূত্র অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী কিনা। এর জন্য চাই ধৈর্য, অটুট মনোবল ও অদম্য কর্ম-প্রেরণা। এই তিনটি যদি বজায় রাখতে পার তা'হলে অদূর ভবিষ্যতে তুমি শুধু যে একজন ভাল ছাত্র হিসেবে গণ্য হবে তা নয়, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবেও পরিগণিত হবে।" অতীশ তার শিক্ষকের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। এই দীর্ঘ ছয় বৎসর তাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছে বনশ্রী। সে তার সঙ্গে আই. এসসি. পড়ত ও পরে মেডিকেল কলেজে

* প্রাণু ও মনোচিকিৎসা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভর্তি হয়েছিল। তার বাবা ছিলেন একজন বড় ডাক্তার। বনশ্রীর মা যখন মারা যান তখন তার বয়স মাত্র দুই বৎসর এবং তার বাবা বিলাতে ডাক্তারী শেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছানোর পর কোনও রকমে পরীক্ষা শেষ করে তিনি দেশে ফিরে মাতৃহারা কন্যাকে বুকে তুলে নিলেন। তারপর তাঁর জীবনে কন্যা আর ডাক্তারী ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্বীয় অধ্যবসায়বলে একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ব'লে গণ্য হয়েছিলেন এবং মেয়েকে স্বাবলম্বী করবার জন্য ডাক্তারী পড়াচ্ছিলেন। বনশ্রী বড় হয়ে শুনেছিল তার বড়লোক দাদু গরীবের ছেলেকে জামাতা করেছিলেন অনেক আশা নিয়ে। জামাইকে নিজের টাকায় বিলেতে ডাক্তারী পড়তে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তার মায়ের 'অবসাদ' রোগ দেখা দেয় এবং মৃত্যু হয় আত্মহত্যায়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন এটা ছিল একটা মানসিক রোগ। রোগের লক্ষণ হ'ল উত্তেজনা এবং অবসাদ।

বনশ্রী জানত তার বাবার জীবনে সে ছাড়া আর কেউ নেই। তার বাবার জ্ঞানতপস্বী মুখ সব সময় তার চোখের সামনে ভাসত। বাবাকে সে কখনও ব্যথা দেবেনা এই ছিল তার আন্তরিক কামনা। বাবার ছায়া সে দেখেছিল অতীশের মধ্যে। তাই তাকে সে এত গভীরভাবে ভালবাসতে পেরেছিল।

অতীশ এম. এস্‌সি. পাস করবার পর তার বাবা তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখন অতীশ বনশ্রীকে বিয়ে করবার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি চান নি। তাঁর বংশধরের বিয়ে হয় একটি উন্মাদরোগীর মেয়ের সঙ্গে। তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বংশকে মানসিক রোগ-চিহ্নিত করিবার কোনও অধিকার অতীশের নেই। তাঁর দৃঢ় ধারণা মানসিক রোগ বংশগত। বনশ্রী তাঁর ঘরে বধূ হয়ে এলে তাঁর বংশে এই রোগের সম্ভাবনা দেখা দেবে। অতীশ যদি নিজের মতে বিয়ে করে তাহলে তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করবেন।

অতীশ ত্যাজ্যপুত্র হতে রাজী ছিল কিন্তু বনশ্রীর বাবা বা বনশ্রী তাতে রাজী ছিল না। বনশ্রীর বাবার ইচ্ছে তাঁর মেয়েকে তিনি বিয়ে দেবেন এমন জায়গায় যেখানে সে সম্পূর্ণ সম্মান পাবে। যদি তাতে কোনও বাধা থাকে বা তার মায়ের সম্বন্ধে কোনও অপমানকর কথা ওঠে, তিনি মেয়েকে আজীবন অবিবাহিত রাখতে কুণ্ঠিত হবেন না। মেয়ের সুখ বা শান্তির জন্যই তিনি আজীবন চেষ্টা ক'রে এসেছেন। তবে মেয়ে যদি অতীশকে বিয়ে ক'রে সুখী হয় তবে বাধা দেবেন না। বনশ্রী অতীশকে গভীরভাবে ভাল বাসত। তার জন্য অতীশকে তার বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন ছাড়তে হবে—এ চিন্তা তার কাছে অসহনীয়। অতীশ সম্পূর্ণ সুখী হ'ক এই তার কামনা। সে অতীশকে বলেছিল যে, বিয়েটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। জীবনের উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতিসাধন। বিয়ে একটা সামাজিক বন্ধন। এই বিয়েতে সে সর্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারে না। যখনই তার মনে আসবে এই বিয়ে একটি পরিবারকে দুর্ভয় আঘাত দিয়েছে, তখনই তার মনে অস্বস্তি আসবে। মনে হবে সে একটি পরিবারের প্রতি অবিচার করেছে, অতীশকে অনেক কিছু হারাতে বাধ্য করেছে। এই মনোভাব নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসতে পারবে না। তার চেয়ে অনেক বেশী কাম্য সারাজীবন অবিবাহিত থেকে তার ভালবাসাকে অক্ষয় রাখা এবং চিরজীবন অতীশের মঙ্গল কামনা করা।

কিন্তু অতীশ তাকে বুঝতে পারল না। সে ভেবেছিল বনশ্রী তার স্বার্থত্যাগকে উপেক্ষা করেছে। এই অভিমানে সে বনশ্রীকে আর জের করে নি বা তার বিশেষ খবরও রাখে নি। আর বনশ্রীও তার কাছ থেকে আপনিই দূরে সরে গিয়েছিল, পাছে তাকে নিয়ে তাদের সংসারে কোনও অশান্তি দেখা দেয়।

এমন সময় অতীশ জানতে পারল সে পদার্থবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি পেয়েছে এবং তার শিক্ষার স্থান ঠিক হয়েছে জার্মাণীতে। কিন্তু এই সংবাদে অতীশ খুব সুখী হতে পারল না। তবে বনশ্রীকে হারিয়ে দেশে থাকতেও তার ভাল লাগছিল না। বনশ্রীর প্রতি একটা দুরন্ত অভিমান সব সময় তাকে যেন চাবুক মারত। তাই বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়ে সে অতি সহজেই মনস্থির ক'রে ফেলল। কিন্তু বিয়ে না দিয়ে অতীশের বাবা তাকে বিদেশে পাঠাতে রাজী হলেন না। অতীশ তখন ক্লান্ত। সে তার বাবার প্রস্তাব মতো চলতেই রাজী হ'ল। ফলে এক শুভদিনে নিখুঁত সুন্দরী ও সর্বসুলক্ষণা শ্রীমতী তুহিনা, রায়বংশে গৃহলক্ষ্মী হয়ে এল। এর তিনমাস পরে অতীশও জার্মাণীর পথে যাত্রা করল।

তারপর দীর্ঘ পনের বৎসর কেটে গেছে। অতীশ আজ পদার্থবিদ্যার একজন অধ্যাপক। কিন্তু যতখানি সম্ভাবনা নিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার স্ফুরণ তার জীবনে অর্ধেকও হয় নি। কোনও রকমে কলেজে যায়, গবেষণা করে। যে সাংসারিক শান্তি বা মানসিক সাম্য থাকা দরকার তা তার ছিল না। একমাত্র সন্তান প্রসবের পর তুহিনার সন্দেহবাতিক দেখা দিল। সে অতীশের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করতে শুরু ক'রে দিল। তার হাব-ভাব আচার-ব্যবহার যে একটা গূঢ় অভিসন্ধিমূলক এ-বিষয়ে তুহিনার সন্দেহ ছিল না। যখনই অতীশ অবকাশসময়ে কোনও কিছু ভাববার চেষ্টা করেছে তখনই তুহিনা মনে করেছে তার স্বামী কোনও মহিলার বিষয় চিন্তা করছে। যখনই কোনও ছাত্রী তার কাছে কিছু জানবার জন্য এসেছে, বাড়ীতে বেধে গেছে তুমুল অশান্তি। তুহিনার এই সন্দেহের পাকচক্র কাটাতে অতীশ অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তুহিনা কিছুই বুঝতে চায় না। সে জানে অতীশ তার প্রতি ঘোর অবিচার করেছে। স্ত্রীর মর্যাদা সে পায় নি। অতীশের চরিত্র এমন জঘন্য যে তুহিনাকে বিষপ্রয়োগ পর্যন্ত করতেও অতীশের বাধবে না। আজ অতীশ বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করতে সাহস করে না। ছাত্রছাত্রীর কাছে মুখ তুলে তাকাতে পারে না। কর্মস্থলে সহকর্মীরা তার অসাক্ষাতে এ-নিয়ে হাসাহাসি করে। সুতরাং যে পারিবারিক শান্তি কর্মপ্রেরণার উৎস, তা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে। অতীশ ভেবে পায়না তার স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য দায়ী কে? তার শ্বশুরকুলে এই রোগ তো কারও নেই। তবে কি তুহিনার এই রোগের জন্য অতীশ নিজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী? কিন্তু তা তো নয়। সে স্বামীর প্রতিটি কর্তব্য একনিষ্ঠভাবে করে। তাকে ভালবাসবার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্ত্রীর দৃঢ়মূল সন্দেহ সে দূর করতে পারে নি। তার প্রতিটি ব্যবহার সে অন্যভাবে নিয়েছে। তার চোখে অতীশের মতো লম্পট, দুশ্চরিত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। তার প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য অন্য কোনও মহিলার মনোরঞ্জন বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা কিংবা তুহিনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত গড়ে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতীশ কোনও দিন সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যেতে পারে না। কোথাও বেড়াতে গেলে তুহিনাকে সঙ্গে নিতে হবে। তাতেও কি বিপদ কম, যখনই গাড়ির বাইরে কিছু দেখেছে তখনই তুহিনা বলেছে "তুমি ঐ মেয়েটিকে দেখলে। লজ্জা করে না এই বয়সেও অন্য মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে?" ফলে অতীশকে একে একে এ-সব আনন্দের উপকরণ ছাড়তে হয়েছে। তুহিনা উত্তেজিত হলে তার কোনও সামাজিকতা বা বাস্তব বোধ থাকে না।

মানুষের সহ্যের সীমা আছে। তারও সহ্যশক্তি এই আঠার বৎসরে নষ্ট হয়ে গেছে। সে তুহিনাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। বাড়িতে চিকিৎসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তুহিনা কোনও

চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলবে না। সে ভাবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ। চিকিৎসার উদ্দেশ্য তাকে শয্যাশায়ী করে অতীশের স্বার্থসিদ্ধি। শেষে আর না পেরে মানসিক হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হ'ল। সেদিনের কথা অতীশ কখনও ভুলবে না। তুহিনা যখন বুঝল তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাসপাতালে পাঠানো হবে, সে উগ্র হয়ে উঠল। অতীশের মূল্যবান সব কিছু ভেঙ্গে ছিঁড়ে নষ্ট করল। তারপর তার পায়ে ধরে আকুতি-মিনতি। সে কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে থাকে না। কি করুণ বুক-ফাটা কান্না। কিন্তু অতীশ তার তিক্ত অভিজ্ঞতায় জানে এ সবই সাময়িক। কিছুক্ষণ পরেই আবার তার সন্দেহ চাঙ্গা দিয়ে উঠবে। তাই সে শক্ত হয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাই করতে লাগল। তখন তুহিনা তাকে অভিশাপ দিতে লাগল, যেন অতীশ কোনক্রমে তাকে পাঠিয়ে সুখী হতে না পারে। অনেক চেষ্টা ক'রে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেও আজ প্রায় দুই বৎসর আগেকার কথা। এই দুই বৎসরে তুহিনার মানসিক অবস্থা মোটেই ভাল হয় নি এবং অধিকাংশ মনোবিদের মত এই যে সে আর কখনও সারবে না। অতীশ তাই ভাবে—তার এই জীবন যে শুধু নিঃসঙ্গ তাই নয়, জীবনের কিছুই সে পায় নি। হতভাগ্য, বঞ্চিত সে। হয়তো বনশ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হলে জীবনটা এমন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ত না। কিন্তু তার বাবা যে ভয় করেছিলেন তা-ই ঘটে গেল তুহিনার জীবনে। তা হ'লে মানসিক রোগ কি বংশগত নয়? যে কেউ এই রোগে যে কোনও সময় আক্রান্ত হতে পারে? এ-প্রশ্নের মীমাংসা কি আজও হয় নি? মানসিক স্বাস্থ্য কি একটি প্রহেলিকা? এই সব চিন্তা অতীশকে অভিভূত ক'রে রাখে। এক এক সময় মনে হয় তুহিনার রোগের জন্য সে নিজে কি দায়ী? সে তুহিনাকে ভালবাসতে পারল না বা তার মনের চাহিদা মেটাতে পারল না ব'লে কি এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে অপরাধবোধ দেখা দেয়। সত্যই তো সে তুহিনার প্রতি একনিষ্ঠ হতে পারে নি। যখনই সে কোনও বিষয়ে আঘাত পেয়েছে তখনই সে বনশ্রীর কথা চিন্তা করেছে। মনে হ'ত তার মা ছেলেবেলায় যেমন শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিতেন, সেই শান্তির আশ্রয় বনশ্রীর কাছেই আছে। মায়ের মহিমা ও আকর্ষণ অনেকখানি সে বনশ্রীর জন্যই অনুভব করেছে। তবে কি সে তুহিনার প্রতি অন্যায় করেছে? এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত কি তুহিনার রোগ? তবে তো এই প্রায়শ্চিত্ত তারই ভোগ করা উচিত ছিল। এই চিন্তা তাকে অসাড় ক'রে দেয়। এমন কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই যার কাছে সে মনের লাগাম খুলে দেয় নিজের মনোকষ্ট লাঘব করে। কিন্তু এতে তার মানসিক সংঘাত কিছু কমে না; উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। তার এই সঙ্গহীন, অসহায় অবস্থায় একদিন শুনতে পায়—ডাঃ বনশ্রী বিশ বৎসর জেনেভায় মানসিক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে দেশে ফিরে আসছেন। অতীশ এই সংবাদে অনেকখানি আশান্বিত হয়। সে তার জীবনের সব কথা খুলে বলবে বনশ্রীকে। তার বিবেক-দংশনের জ্বালা কিছু কমাবে।

বনশ্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে আরও যেন সুন্দর মনে হ'ল। তার কাছে অতীশ যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পায়। তাকে সব কিছু খুলে বলে মনের ভার অনেকটা হাল্কা বোধ করল। জিজ্ঞাসা করল তুহিনার রোগের জন্য অতীশ দায়ী কিনা। বনশ্রী তাকে অনেক প্রশ্ন করে ও তুহিনার বংশ পরিচয় এবং তার জন্মকাল থেকে মানসিক রোগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যাবতীয় বিবরণ নিয়ে আসতে বলে। সমস্ত বিবরণ না পেলে তার পক্ষে কোনও মতামত দেওয়া অসম্ভব।

সমস্ত বিবরণ বনশ্রীকে অতীশ দিয়েছিল। বনশ্রী সকল বৃত্তান্ত শুনে বলেছিল অতীশ তুহিনার রোগের জন্য

দায়ী নয়। বনশ্রী অনেক কথাই তাকে বলেছিল মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যা অতীশের ভাঙা মন আবার নতুন করে উজ্জীবিত ক'রে তোলার পক্ষে সহায়ক হ'ল।

বনশ্রী জানিয়াছে মন একটা ভাবের রাজ্য। মানসিক রোগকে সোজা কথায় বলা যায় অসামাজিক বা বাস্তব-বিরোধী পন্থায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। এই পন্থা রোগী কেন অবলম্বন করল তা আমাদের জানতে হবে। নানা ইচ্ছা, ও কামনা আমাদের মনোরাজ্যকে পরিচালিত করছে। কামনার চরিতার্থতা হয় আমাদের শরীরের মাধ্যমে ও তার কর্মস্থান হ'ল কাম্য বিষয় ও পরিবেশ। কামনার লক্ষ্য হ'ল আনন্দ লাভ করা। শৈশবাবস্থা থেকে এই বাসনা আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে ধাবিত। প্রথমে আনন্দই থাকে লক্ষ্য; পরে মন যত পরিণত হতে থাকে ততই বাস্তবতার সীমার মধ্যে যথাসম্ভব সুখ ও আনন্দ লাভ করাই হয় উদ্দেশ্য। মানসিক সুস্থতার একমাত্র মাপকাঠিই হ'ল বাস্তবতার ভিতর পরিণত আনন্দময় জীবনযাপন।

কিন্তু এই লক্ষ্যে আসতে আমাদের অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়। এবং তার কোনও স্তরেই মন আটকা প'ড়ে গেলে আর পরিণতির দিকে সম্পূর্ণ ভাবে এগুতে পারে না ফলে মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এই সব বিষয় নিয়ে বনশ্রীর সঙ্গে অতীশের অনেক দিন ধ'রে অনেক আলোচনা হয়।

বনশ্রী বলেছিল, মানসিক রোগ উৎপত্তির কারণ দুইটি, বংশপ্রভার এবং পরিবেশ। ডাঃ বনশ্রীর মতে নিজের শরীরকেও পরিবেশ হিসাবে গণ্য করাই ভাল। এই শরীর যদি বংশগত কোনও রোগে মানসিক শক্তি বিকাশের অনুকূল না হয় তবে সেই মন সুসম্বদ্ধ পরিণতি লাভ করতে পারে না। সেই রকম ক্ষেত্রে মানসিক রোগ বংশগত হিসাবে দেখা যায়। আবার শৈশবে এই শরীর যদি অর্জিত কোনও রোগে দুর্বল হয়ে পড়ে ও ইচ্ছাশক্তির আধার হিসাবে নিস্তেজ হয়, তখনও মন সুস্থ পরিণতি লাভ করতে পারে না।

এ ছাড়া পরিবেশ যদি ক্রমাগত আমাদের কামনার প্রতিকূল হতে থাকে, তখনও মানসিক শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে পারে না। শৈশবের যে কোনও স্তরের ভিতরেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই পরিবেশই জীবনকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। শিক্ষা, দীক্ষা, শাসন, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকলই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দেখা যায় পরিবেশ অতীব শক্তিশালী। পরিবেশ যদি অনুকূল হয় তবে দুর্বল মনও কোনও লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে কাজ চালিয়ে নিতে পারে। এমন কি পরিবেশ যদি বংশগত দুর্বল মনকে চাপ বেশী না দেয় তা হ'লে হয়তো সারাজীবন কোনও রোগলক্ষণ নাও প্রকাশ পেতে পারে।

ডাঃ বনশ্রী আরও জানিয়েছিল যে, মানসিক রোগ একটা সন্ধি। এই সন্ধি অতৃপ্ত বাসনার সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতের ভিতর দিয়ে নানাভাবে ঘটছে। আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপাদান আছে। এই তিনটি উপাদান যদি সার্থকভাবে সমন্বিত হয় তখন আমরা তাকে সুস্থতা বলি। কিন্তু এর একটি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যেতে পারে। যে উপাদানটি বেড়ে গেল সেই উপাদানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানসিক রোগের নামকরণ করা হয়।

ডাঃ বনশ্রী উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছিল তার মায়ের অবসাদের মূলে তার শৈশবাবস্থার আমাশয় রোগ। এই আমাশয় চলেছিল দীর্ঘ ন-দশ মাস। তার ফলে তাঁর চিত্ত উৎসাহ সেই স্তরেই আটকা পড়ে ও নিরুদ্ধ হয়। তার লক্ষণ প্রকাশ পায় পরিণত জীবনে অবসন্নতার ভিতর দিয়ে। আবার তুহিনার রোগের কারণ ছিল সে বাল্যাবস্থায় তার বাবার স্নেহ বা ভালবাসা পায় নি। তুহিনার মনে তার মা তার বাবার জায়গা দখল ক'রে ছিলেন। এই নির্জ্ঞান সমকামিতার ফলে বাবার কাছ থেকে না-পাওয়া স্নেহ বা আদর তার নির্জ্ঞান মনে নিরুদ্ধ হয়ে পরিণত জীবনে প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহবাতিক রূপে। আর অতীশের ভিতর যে

অবসন্নতার ছাপ এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটা সাময়িক পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া। সুতরাং মানসিক যোগ সৃষ্টি হওয়ার মূলে কতগুলি নির্দিষ্ট কারণ থাকা দরকার। মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার ভিতর সামান্য একটি সেতু বর্তমান। এই সামান্য সেতু উপরোক্ত যে কোনও উপায়েই নিশ্চিহ্ন হতে পারে। মানুষ নিজেকে ঠিকমতো বুঝতে পারলে ও তার প্রবৃত্তির প্রকৃতি অনুভব করতে পারলে মানসিক অসুস্থতার আর সম্ভাবনা থাকে না।

অতীশের মনে হ'ল বনশ্রী তাকে নতুন জীবন দান করেছে। তার আর কোনও গ্লানি নেই। সে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারছে। এই আত্মোপলব্ধির জন্য ডাঃ বনশ্রীকে সে কৃতজ্ঞতা জানায়। সে তার একমাত্র সন্তানকে ঠিকমতো মানুষ ক'রে তোলবার জন্য ডাঃ বনশ্রীর হাতে সঁপে দেয়।

অতীশ বনশ্রীর সহায়তায় পুর্ণ উদ্যম ফিরে পায়। তারও অনেক কিছু করবার আছে। সমগ্র দেশকে দান করবার সামগ্রী আজও তার নিঃশেষিত হয় নি। সে স্বার্থপর নয়। সে ভাবে তার ছাত্রাবস্থার আদর্শ। তার অধ্যাপকের ভবিষ্যদ্বাণী সে সফল ক'রে তুলবে। জীবনের নবপ্রভাতে সে ডাঃ বনশ্রীকে মনে মনে শত নমস্কার জানায়, শুভকামনা জ্ঞাপন করে।

নাম মনে করতে না পারার কারণ

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

আমি ১৮৯৮ সালে বিস্মৃতিপ্রবণতার মানসিক কারণ সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এখন তার বক্তব্য আবার শুনিয়ে সেই সূত্রে আরও কিছু আলোচনা করব। সেই প্রবন্ধে একটি সাধারণ বিষয়ের মানসিক কারণ বিশ্লেষণ করেছিলাম—অনেক সময় আমরা লোক বা স্থানবিশেষের নাম ভুলে যাই, সাময়িকভাবে তা মনে আনতে পারি না এবং তাতে আমার দেখা একটি দৃষ্টান্ত থেকে স্থির করেছিলাম যে এই সাধারণ এবং তুচ্ছ মানসিক ত্রুটিটিরও একটা গুঢ়তর তাৎপর্য আছে; প্রচলিত ব্যাখ্যা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

যদি কোনও মনোবিংকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আমাদের জানা নাম অনেক সময় আমরা ভুলে যাই কেন? তিনি সম্ভবত তার উত্তরে বলবেন যে, অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে নামগুলি নিয়েই বেশী ভুল হয়। নাম সম্পর্কে বিস্মৃতি-প্রবণতার এই পক্ষপাতিত্ব কেন তার একটা বিশ্বাস্য যুক্তিও তিনি হয়তো দেখাতে পারেন, কিন্তু কোনও গভীরতর কারণের অস্তিত্ব তিনি অনুমান করবেন না।

সাময়িক নাম-বিস্মৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়াতেই আমি প্রথম বিষয়টি বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সব জায়গায় না থাকলেও কোনও কোনও জায়গায় বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। যে-সব ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া ছাড়াও মন কতকগুলি ভুল নামকে আসলের বদলে বার বার তুলতে থাকে। ভুল ব'লে বুঝতে পারলেও এই সব নকল নামকে থামানো বড় শক্ত। যে প্রক্রিয়ায় ভোলা নামটিকে আমাদের মনে টেনে তুলি বোধ হয় তা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্য একটা নকল নামকে টেনে আনছে।

এখন আমার অনুমান, মন হঠাৎ এরকম অকারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, এরও একটি নিয়ম আছে অর্থাৎ ভুলে-যাওয়া নামটির সঙ্গে বদলি নামগুলিরও একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক যদি আমি দেখাতে পারি তা হলে আশা করি কী থেকে সাময়িক নামবিস্মৃতির উৎপত্তি তা-ও খানিকটা বোঝাতে পারব।

১৮৯৮ সালের প্রবন্ধটির দৃষ্টান্তে একটি চিত্রশিল্পীর নাম ছিল। শিল্পী অরভিয়েতোর গম্বুজের ভেতরে জমকালো প্রাচীর চিত্র 'শেষ বিচার'-এর রচয়িতা, নাম সিগ্‌নোরেল্লি। ভুল ব'লে জানা সত্ত্বেও সিগ্‌নোরেল্লির বদলে বত্তিচেল্লি আর বোলত্রাফিও এ-দুজনের নাম বার বার মনে উঠছিল। যখন অন্য একজন আমাকে আসল নামটি ব'লে দিলেন তখন সেটা ঠিক ব'লে বুঝতে আমার কোনও সংশয় বা দেরী হল না। যে প্রভাবের ফলে এবং যে ভাবানুষঙ্গের পথে সিগ্‌নোরেল্লির বদলে বত্তিচেল্লি এবং বোলত্রাফিওর নাম মনে পড়ছিল তা পরীক্ষা করে দেখাতে এই রকম পেলাম—

ক) সিগ্‌নোরেল্লির নাম অপরিচিত বলে কিংবা যে-প্রসঙ্গে এ নাম তুলেছিলাম তার কোনও বিশেষত্ব ছিল ব'লে যে ভুলে গিয়েছিলাম তা নয়। এ নাম

---

* সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড প্রণীত Psychopathology of Everyday Life (প্রাত্যহিক জীবনের মনোবিকার) বইটির ইংরেজী অনুবাদ ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। ডাঃ এ. এ. ব্রিলের ভূমিকাসহ এই ইংরেজী সংস্করণটি মূল লেখক কর্তৃক সমর্থিত। বর্তমান প্রবন্ধ ইংরেজী সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদের বাংলা তর্জমা। অনুবাদক—বিজয়কেতু বসু, বি.এসসি., এম-বি., বি.এস.। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ)

আমি বস্তিচেল্লির নামের মতোই সমান জানতাম, বরং বেলেত্রাফিওর নাম খুবই কম শুনেছি, এবং তিনি মিলানগোষ্ঠীর শিল্পী, এর বেশী কিছু জানতাম না। যে-প্রসঙ্গে নামটি উঠেছিল তাও আমার কাছে নির্দোষ মনে হল এবং তা থেকে আর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। আমি গাড়ি করে ডালমেশিয়া অঞ্চলের রাগুসাবাসী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হারজিগোভিনার এক ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। কথোপকথনের মধ্যে ইতালী ভ্রমণের প্রসঙ্গ উঠল এবং আমার সঙ্গীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি অরভিয়েতো কখনও গিয়েছেন কিনা এবং সেখানকার বিখ্যাত শিল্পী—র প্রাচীর চিত্রগুলি দেখেছেন কিনা।

খ) এ প্রসঙ্গের ঠিক আগে কি আলোচনা হয়েছিল তা যতক্ষণ মনে করতে না পারলাম, নাম ভুলে যাওয়ার কোনও কারণ ততক্ষণ খুঁজে পাই নি। মনে পড়ার পর বুঝলাম পূর্বপ্রসঙ্গ থেকে উত্তরপ্রসঙ্গের ব্যাঘাত ঘটাতেই বিস্মৃতির উৎপত্তি। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার সঙ্গীকে অরভিয়েতোর কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বসনিয়া ও হারজিগোভিনা অঞ্চলে যে-সব তুর্ক বাস করে তাদের রীতিনীতি আলোচনা করছিলাম। আমার এক সহযোগী তাদের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তাই গল্প করছিলাম। তুর্করা চিকিৎসককে বড় বিশ্বাস করে, আর খুব বরাত মানে। যখন কোনও ডাক্তার বাধ্য হয়ে তাদের জানায় যে রোগীর আর বাঁচবার আশা নেই, তারা বলে "মশায় (Herr) আমি আর কি বলব? যদি ওকে বাঁচাবার কোনও রাস্তা থাকত তো আপনি বাঁচাতে পারতেন তা আমি জানি।" কেবল এই কথাগুলির মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আমরা বসনিয়া, হারজিগোভিনা এবং হের্ (Herr) অর্থাৎ মশায় শব্দগুলি পাচ্ছি যাদের সিগ্‌নোরেল্লি, বস্তিচেল্লি ও বোলত্রাফিওর সঙ্গে এক ভাবানুষঙ্গ সূত্রে গাঁথা যায়।

গ) আমি ধ'রে নিচ্ছি যে বসনিয়ার তুর্কদের রীতিনীতি সংক্রান্ত চিন্তাস্রোত শেষ হবার আগেই আমি আমার মনোযোগ তার থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম ব'লে সে চিন্তাস্রোত পরবর্তী চিন্তাকে বাধা দিয়েছিল। কারণ, আমার মনে পড়ল প্রথম গল্পটির শেষে আমার আর একটি গল্প শোনাবার ইচ্ছা হয়েছিল। তুর্করা কামসুখকে বড় দামী মনে করে এবং ইন্দ্রিয়সংক্রান্ত ব্যাধিতে বিশেষ বিচলিত হয়। তাদের এই স্বভাব আর প্রাণসঙ্কটের সময়েও তাদের অবিচলিত আত্ম-সংযমের অভ্যাস পাশাপাশি তুলনা করলে বিস্ময়কর মনে হয়। আমার এক সহযোগীর রোগী একবার তাঁকে বলেছিল "আপনি তো বোঝেন মশায়, ও-সুখই যদি না রইল তবে জীবনের সব আকর্ষণই বৃথা।" অপরিচিত ভদ্রলোকের এ-শ্রেণীর আলোচনা সমীচীন হবে না ভেবে কথাটা চেপে যাই। তারপর মৃত্যু ও কামিতার চিন্তা থেকে বিষয়ান্তরে মন দিই। সপ্তাহ কয়েক আগে ত্রাফোইতে থাকার সময় একটি দুঃসংবাদ পেয়েছিলাম। তার প্রভাব তখনও পুরো কাটিয়ে উঠতে পারি নি। আমার এক রোগী আত্মহত্যা করেন, তিনি ইন্দ্রিয়সংক্রান্ত দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তাঁর জন্য আমি খেটেছিও অনেক। হারজিগোভিনা যাত্রার সময় এই শোচনীয় ঘটনা বা তার সম্বন্ধে কোনও কথা আমার মনে প্রত্যক্ষভাবে ওঠে নি তা জোর করেই বলতে পারি। তবু ত্রাফোই এবং বোলত্রাফিও শব্দ দুটির সাদৃশ্য থেকে, দুঃখের স্মৃতিকে ভোলার চেষ্টা সত্ত্বেও যে সেটা ইতালীভ্রমণের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছিল, এ কথা ধ'রে নিতে বাধ্য হচ্ছি।

ঘ) সিগনোরেল্লির নাম ভুলে যাওয়াকে আমি আর আকস্মিক ব'লে ভাবতে পাচ্ছি না। আমার ভুলটা 'উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' ব'লে ধ'রে নিতে হচ্ছে। তুর্কদের রীতিসংক্রান্ত চিন্তা বলতে গিয়ে খেনে যাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এবং পাছে সে চিন্তা ত্রাফোইতে পাওয়া দুঃসংবাদটিকে মনে পড়িয়ে দেয় এজন্য এসব

কথা মন থেকে সরাবার উদ্দেশ্যও আমার মধ্যে একাজ ক'রে যাচ্ছিল। এক কথায় আমি কিছু ভুলতেই চাইছিলাম, কোনও বিষয় অবদমিত করেছিলাম। ঠিক বলতে গেলে অরভিয়েতোর শিল্পীর নাম ছাড়া অন্য একটা কোনও বিষয় ভুলতে চাইছিলাম। কিন্তু অন্য চিন্তাটি এই নামের সঙ্গে ভাবানুষঙ্গ দিয়ে যুক্ত থাকায় নামটি মনে আনতে পারি নি। একটি বিষয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুললাম, অপরটি ইচ্ছা করেই ভুললাম। একটির বেলায় মনের অনিচ্ছা আর অপরটির বেলায় অক্ষমতাটাই দেখা গেল। যদি অনিচ্ছা আর অক্ষমতা দুই-ই এক বিষয়ে প্রকাশ পেত তা'হলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হ'ত। এই ব্যাখ্যায় প্রতিকল্প নামগুলিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলাম এখন আর তা পারছি না। আপস রফার মতো এসব নাম একদিকে যেমন যা ভুলতে চাই তাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে তেমনি আবার যাকে মনে করতে চাইছি তাকে ভুলিয়েও দিচ্ছে। এসব থেকে দেখা যাচ্ছে আমার মনে আনার চেষ্টা পুরোপুরি সফলও নয় বা পুরোপুরি বিফলও নয়।

ঙ) মৃত্যু ও কামিতা প্রভৃতির যে-চিন্তাস্রোত আমি চাপতে চেয়েছিলাম এবং যে-সূত্রে বসনিয়া, হারজিগোভিনা ও ত্রাফোই-এর নাম উঠেছিল তার সঙ্গে বিস্মৃত নামের একটা অভিনব ধরনের যোগাযোগ আছে। এখানে একটি ছকে এই সম্বন্ধটি এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এটি ১৮৯৮ সালে প্রথম প্রকাশ করেছিলাম।

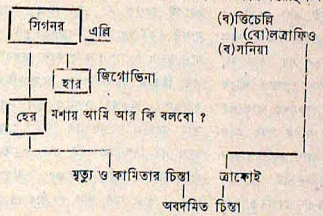

এতে দেখা যাচ্ছে সিগনোরেল্লির নামটি দুই টুকরো হয়েছে। এক টুকরো বস্তিচেল্লির মধ্যে সোজাসুজি ঢুকে পড়েছে অন্য টুকরোটি ভাষান্তরিত হয়ে অবদমিত বিষয়ের সঙ্গে নানারকমের বিচিত্র সম্বন্ধ পাতিয়ে মনে ওঠবার সময় হারিয়ে গেছে। এই অংশটির রূপান্তর বাচ্যার্থ বা ধ্বনিসাদৃশ্য অনুযায়ী হয় নি, 'হারজিগোভিনা ও বসনিয়াকে কেন্দ্র ক'রে যে সব চিন্তা চলছিল সেই অনুযায়ীই হয়েছে। ছবির ধাঁধা যেমন হয় নামগুলি অনেকটা সেই রকম ছবি দিয়ে লেখা কথার মত। সমস্ত প্রক্রিয়া মনের কাছে অজানা রইল, শুধু সিগনোরেল্লির বদলে কতকগুলি অন্য নাম মনে উঠল। হঠাৎ দেখলে সিগ্‌নোরেল্লির সঙ্গে অবদমিত বিষয়ের যে একটা সম্পর্ক আছে তা নজরেই পড়ে না।

অন্যান্য মনোবিদরা স্মরণক্রিয়া বা ভুলে-যাওয়া বোঝবার জন্য যে-সব কারণকে প্রয়োজনীয় মনে করেন আমি সে-মতের বিরোধী নই; তবে তাঁদের চেয়ে একটা কথা বেশী বলতে চাই যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে নাম ভুলে যাওয়ার পিছনে মনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমার ব্যাখ্যায় ভুল স্মৃতি কি কৌশলে তৈরী হচ্ছে তাও খুলে দেখিয়েছি। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে-সব কারণসমাবেশের উল্লেখ করা হয়

আমার ব্যাখ্যাতে তাদের অস্তিত্ব ধ'রে নেওয়া দরকার কেন না তাদের সাহায্যেই অবদমিত বিষয় বিস্মৃত নামকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে। যেখানে ভুলে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ নেই হয়তো সে নামের ক্ষেত্রে এটা হ'ত না। আমার ধারণা অবদমিত চিন্তাগুলি বাইরে আসার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে কিন্তু যেখানে অনুকূল অবস্থা পায় সেখানেই শুধু দেখা দেয়। বাইরে আসার সুযোগ না থাকলে সে-চিন্তা এমন ভাবে চাপা পড়ে যে তার কোনও লক্ষণই আর টের পাওয়া যায় না।

আসল নামের বদলে ভুল নাম মনে পড়ার কারণ-গুলো আবার বলছি। প্রথমতঃ ভুলে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ ঠিক আগেই মনের একটা চিন্তা চাপার চেষ্টা হওয়া চাই এবং তৃতীয়তঃ বিস্মৃত নাম ও অবদমিত চিন্তার মধ্যে একটা বাহ্য সংযোগ থাকা চাই। শেষেরটি তেমন গুরুতর নয়, কেন না, অতি সামান্য সম্বন্ধ থাকলেই এ রকম সংযোগ ঘটতে পারে। অবদমিত চিন্তা, এই রকম বাহ্যসম্বন্ধ থাকলেই বিস্মৃতি ঘটাতে পারে, না সেজন্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হলে তবে পারে সে কথা বলা শক্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ঘনিষ্ঠতার দরকার নেই, সমকালীনতাই যথেষ্ট। কিন্তু বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখা যায় যে অবদমিত চিন্তা ও বিস্মৃত নামের মধ্যে কালগত আর অর্থগত দু-রকম সম্পর্কই আছে। সিগনোরেল্লির বেলাতেও তা দেখান যেতে পারে।

সিগনোরেল্লির দৃষ্টান্তে যা শিখলাম তার মূল্য কতখানি সেটা নির্ভর করছে এ-জাতীয় বিস্মৃতি ব্যাপক কি-না তার ওপর। আমার মতে এটা প্রায়ই দেখা যায়, খুবই সাধারণ। যতবার নিজের মধ্যে বিস্মৃতির প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছি ততবারই দেখেছি এর ভেতর চিন্তা চাপার উদ্দেশ্য রয়েছে।

আমার মতের স্বপক্ষে আমি আর একটি যুক্তি দেখাব। আমার বিশ্বাস যেক্ষেত্রে বিস্মৃতির সঙ্গে ভুল নাম মনে ওঠে আর যেক্ষেত্রে তা ওঠেনা তাদের ভিন্ন জাতের বলে মনে করা ভুল। প্রতিকল্প নাম কোনও কোনও ক্ষেত্রে আপনা হতে মনে আসে আবার কখনও কখনও একটু চেষ্টা করলে তবে মনে আসে। যে ভাবেই আসুক না কেন বিস্মৃত নামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একই ধরনের। সম্ভবতঃ দুটি শক্তি প্রতিকল্প নাম মনে ওঠার ব্যাপারে কাজ করে; প্রথম মনোযোগের চেষ্টা এবং দ্বিতীয়, চিন্তাবিষয়ের সঙ্গে জড়িত একটি আভ্যন্তর আবেগ। অতএব যেখানে ভুল নাম মনে ওঠে না তার মধ্যেও অনেকগুলি সিগনোরেল্লি শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। তবে সব বিস্মৃতিই এই এক জাতের এ কথা বলতে পারি না। আরও সরলতর নামবিস্মৃতি আছে সন্দেহ নেই। তাই, যদি বলি যে সাধারণ নাম ভুলে যাওয়া ছাড়া একজাতের অবদমনপ্রণোদিত বিস্মৃতি আছে তা হলেই যথেষ্ট সতর্কতা হবে।

লুম্বিনির—
রচনা ও কলা

চিত্তভ্রংশী ভ্রমবাতুলতা

(Paranoid Dementia)

"ত্রুটি করেনি সকলেই দিয়ে খুশি তাঁরা ত্যাগধর্ম্ম পালন করে কৃতার্থ হয়েছেন আমাদের বাংলা দেশ রাজোয়াড়া না হলেও আদেয় কিছু রাখেনি তার জোড়া কোন দেশ বা প্রদেশ ছিল তা জানিনা সে তার আগেই জাত দিয়েছে ইংরেজকে দেবতা বলে নিয়েছে—প্রসাদ পেয়েছে নিজের স্বভাব আচার অনুষ্ঠানাদি ধাতের জিনিষ ছেড়েছে বাক্যের কথায় ভাষা বদলেছে পত্র ব্যবহারে বাপকে মাই ডিয়ার ফাদার লিখেছে স্ত্রীকে ওয়াইফ বলে আনন্দ পেতে শিখেছে কাজে কর্ম্মে গেটের মাথায় ওয়েল কাম লিখেছে—আশে পাশে গড সেভ দি কুইন লং লীভ দি কুইন দুধার উজ্জ্বল করেছে সাহেবের অনুচর চাপরাসীকে সার বলেছে চেয়ারও দিয়েছে—পাইপ দাঁতে চেপে চিবিয়ে কথা কইতে অভ্যাস করেছে কুকুরের মুখে চুমো খেয়েছে তাকে শেক হ্যাণ্ড করতে তালিম দিয়েছে ভদ্র সভায় রুমালে থুতু ফেলে বুক পকেটে রেখেছে বাপের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতদের লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টল মেন বলে গাত্রোত্থান করতে আহ্বান করেছে আবশ্যকে অনাবশ্যকে ভুতো শহর থেকে সাইড স্প্রিং জুতো পরে এসে আমাদের অভিভূত করেছে এমন চুল ছেটে এসেছে চেনা যায় না বলে রুমালখানা আস্তিনে গুঁজতে হয় জানিস না কিরে নটবর আড়াই টাকা দিয়ে নাপিতকে ঘাড় ছাঁটা ক্লিপার কিনে দিয়েছে ইভালিউশন কথাটার অর্থবোধের আগেই তার সঙ্গে দেখা দেখা হয়ে গিয়েছে মদ্যপাজীর একার ওকার জানা বেকার ছেলেদের ফেরা না করে নিতেন সে কথা উদ্যোগ পর্ব্বে বলেছি তাই কর্ত্তারা তাঁদের দেবতা না ঠাউরে পারেন নি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাবুদের নৌকো গড়িয়ে বাচ খেলার প্রতিযোগীতা প্রবল ছিল তাতে সাহেবদেরও আহ্বান থাকত তাঁরা বাচ দেখতে আসতেন জলযোগের ব্যবস্থাও থাকত ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে বড় লোকেদের প্রমোদ উদ্যানাদি থাকত এখনও আছে মাড়োয়ারীদের—অধিকাংশ শনিবার উদ্যান হেসে উঠত মাছধরা নাচগান মদ্যপান চলত ছোট সাহেবেরাও জয়েন করতেন বড়লোকেরাও বড় চাকরের পুজা বা বিবাহাদি উৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরাও সস্ত্রীক আসতেন যাত্রা বাইনাচ থাকত খানার ব্যবস্থাও থাকত এইরূপ মেলামেশায় প্রীতি সদ্ভাব স্বতঃই বাড়ত কর্ত্তারা ছিলেন সেকেলে সাদা সিধি লোক গল্প গুড়ুক হাসি তামাসা আর তাস পাশা নিদ্রায় দিন কাটত বা বয়স কাটত বড় কাজের মধ্যে পঞ্চায়েৎ দলাদলি একটা কিছু রাখতেই হত নচেৎ অনাবশ্যক হয়ে পড়তে হয় রাজনীতির গোলক ধাঁধায় কোনওদিন তাঁরা গলা বাড়ান নি বলতেন ওসব রাজাদের জন্যে। আমরাও বুঝতে চাইনা অদোর ব্যাপারী ছেলেদের চাকরি দিয়ে আয়ের উপায় করে দিচ্ছে আবার কি মাথায় করে নাচবে না কি পরগণায় এজলাস চুরি ডাকাতি অন্যায় অত্যাচার জমিদারদের জুলুম কমে গেছে শহর-তলীর লোক তাঁদের ধারণা ও অদেশমত সংসারের ভাঙ্গাগড়া চলত তারা সাহেবদের নরনারায়ণ বলে চিনেছিলেন সে কথা দেবতা বদলের উদ্যোগ পর্ব্বে একটু বলেছি বিস্তারিত শুনলে আজকালের তরুণেরা আমাদের ঘৃণ্য জীব বলে মুখ করা যে ট্রেটার বলতেও পারে সেই আমরা—আজ নব বিধানের আওড়ে পড়ে ধান ভানছি যকে তখন নাকি বিলেত থেকে বড় ঘরের বা বনেদী ঘরের ছেলেরা নব অধিকার পাকা করতে আসতেন তাঁদের কথাবার্ত্তা ব্যবহার মোলায়েম ও মিষ্ট ছিল বেছে গুছে মিশতেন নটা শিক্ষাগুরু ডিরোজিও

সাহেবের কল্যানে অনেকেরই সহজ হয়েছে বেড়েছে সভ্যতার অঙ্গ রূপেই তার আগে জমিদারদের ছেলেদের মধ্যেই ছিল কি কহব আনন্দ ওর কই কোন প্রদেশের কজন তখন তা পেরেছিলেন আমরা ছিলাম সমাজ কর্ত্তাদের অনুগত।"

(২) "আমি কি ভিতরে কিছু লুকোচ্ছি? লুকিয়ে লাভ? আগুনে ভস্মীভূত গেলেই তা একেবারে যাবে কিংবা যজ্ঞের পবিত্র হোমানলে সব অপুণ্য পুণ্য হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই। আমি সেদিন দক্ষিনেশ্বরে কালী ঠাকুরের সামনে বলে এলাম মা খুব জোড় দিয়ে তাহলে এই মা আমায় পুন্যবতী করো। আর রাধা কৃষ্ণের মন্দির বলেছি হেদের (হেমা) আমায় চিন্ময়ী করো প্রেমময়ী করো (এটি প্রেমময়ী) আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বসেছিলাম বিবেকানন্দের কথা আমাকে মানুষ করো এটাও বলেছিলাম মাকে এখন বুঝছি চিন্ময়ীও যা প্রেমময়ীও তা। একই আনন্দ। কালী বলেন নেই নেই—আর কৃষ্ণ বলেন আছে আছে (অস্তি অস্তি) আসলে দুইই চিন্ময় সত্তা। কালী ও কৃষ্ণ এক দুইয়েরই সাগর মহাসাগর যা না সাগর, যা চির প্রশান্ত, বুঝতে পারছি মাই আমাকে ডাকছেন। B.A.তে শাক্ত পদাবলী বেশী ভাল লাগত না, ওর হাড় কঙ্কাল বাস্তবতা সহ্য হোতনা, বোধ হয় কি সতিাই মা উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে তার হাড় কঙ্কাল নরমুণ্ডের রহস্য বোঝাবার জন্য। কিন্তু পায়ে যে বাধা আমার পথ চলায়—বাধা বাধা ঠেকছে কেন? পায়ে যেন অলক্ষ্মী বাধা। বন্ধন মুক্ত কব হে ঠাকুর। দুই এক কর।

"ঠিক এই সময়—বীনা নামে রোগীটি এসে উপস্থিত। ও কেন আসে? ও যেন ঠিক এই তত্ত্বের এইখানটায় একটা বাধা দিয়ে গেল। তবু যেতেই হবে—কালী-তত্ত্বের রহস্য ভেদ করতে হবে। দুই তত্ত্বের সামঞ্জস্য করতে হবে। Scientist ও Artist এর মিলন ঘটাই কি করে, বাধাটা কোথায়—বাধা আমার মনেই বুঝতে পারছি। (এইখানে আবার বাস্তবে এসেছি)। তবু যে বাধা তাতো মুক্ত করা যায়। মুক্ত না করলেও মুক্তি পাওয়া যায় না।

"এ সব লিখলেই ভাল থাকি, লেখা থামলেই (বেশীর ভাগ সময়—কতকগুলো কি যেন খারাপ এসে কিলবিল করতে থাকে মাথায়) ওদের আমি মায়ের পুজোয়ই বলি দিতে চাই ঠিক রক্ত জবার মত তা অর্ঘ্য হয়ে উঠুক। নিজ্ঞান মনে যদি ওগুলো বলিদান হত এক সঙ্গে কিংবা আস্তে আস্তে তা হলে বেচে যেতাম। একসঙ্গে হলেই **সবচেয়ে ভাল**। ওদের আলাতন থেকে মুক্তি পাই—বলি হোক, অশুভের বলি হোক। ভাল লাগেনা আর ওদের একটুও না—কি জ্বালাতন করে আমায়, মাথার ভিতর চিন্তার কেবল গুলি খাচ্ছে। অশুভকে সম্পূর্ণ বলি দিয়ে মুক্তি দাওহে ঠাকুর। অশুভ চিরকালের অশুভ, ওদের কখনও ভাল মনে করতে নাই, তা যে বিবেকেরই জড়তা। মা তো পরম আদরে অশুভকে খান তাই যেমন করে পারুন তিনি গিলুন। তার হাড় গোড় রক্ত মাংস কঙ্কাল বিষ জ্বালা সব। সর্ব্বনাশী আমাকে খেতে বসেছিল এবার বুঝতে পারছি। খা খা তোর খারাপ অসভ্যগুলো খেয়ে ফেল যত পারিস। যত পারিস। তাড়াতাড়ি। জিভের তলায় তবু বিষ ঢেলে রেখেছিস—দাঁতেও। তাতে তোর লাভ? নিয়ে যা তোর বিষ লিরলিরানি পেটের পচা খারাপ চোখের আঠা। কি দরকার তোর এসব আমাকে দিয়ে? মাথাটাকে তো চিবিয়ে খাচ্ছিস। মুখের ভেতরটা তোর রসনায় কেমন একটা বিশ্রী লালা সব নিয়ে যা। একেবারে উঠাও হ। নিয়ে যাবি কিন্তু ঠিক নইলে তোর সঙ্গে আমার লড়াই বাধবে ভীষণ। তখন দেখিয়ে দেব—আমি **অপরাজিতা**। আমি ভগবতী। আমি গৌরী, আমি পার্ব্বতী, তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কিসের? সরস্বতীর সাদা পদ্মে তোর সব কালো (তমসা অজ্ঞানতা) দূর হয়ে যাবে। স্পর্শ দরকার তোর সেই পদ্মের নইলে রাক্ষুসী যাবি না—না? দাড়া যেতেই হবে তোকে। আগে বুঝে দেখি স্পর্শ দরকার

কি দরকার নয়? ভয় আছে এখানে—ভয়ভঞ্জন হরি সে কথা আমায় বুঝিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই।"

★ ★ ★

উপরে উদ্ধৃত পর পর দুইটি অংশই দুইজন মানসিক রোগগ্রস্ত মহিলার লেখা। উভয়েই চিত্তবংশী ভ্রম-বাতুলতা রোগে ভুগছিলেন। ঐ রোগে মানসিক অবনতি ঘটায় অর্থাৎ মনের অবস্থা শিশু অবস্থায় ফিরে যায়; মানসিক বৃত্তিসকল সুষ্ঠুভাবে কাজ করে না। অসংলগ্ন চিন্তা আসে, বাস্তিক জগত সম্বন্ধে একটা উদাসীনতা আসে, রোগী ধারাবাহিক চিন্তা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, চিন্তার সূত্র হারিয়ে যায়, যুক্তি বোঝবার ক্ষমতা থাকে না, উপরন্ত একটা ভুল ধারণা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। কেউ মন্দ করছে এই ধরনের ভুল ধারণাও থাকে, সন্দেহ থাকে।

প্রথম মহিলাটি বিবাহিতা, বয়স্কা, নিঃসন্তান; বহুদিন ধরে ঐ রোগে ভুগছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে লক্ষ্য করবেন কোথাও দাঁড়ি, কমা কিছুই নেই—এক নাগাড়ে লিখে গেছেন, অনেক সময় শব্দগুলো ছড়িয়ে গিয়ে কতকগুলো অক্ষরের সমাবেশ হয়েছে। কোথাও কোথাও অর্থহীন শব্দও রয়েছে। মানসিক অবনতির (mental deterioration) লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। লেখার অর্থ বার করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে কারুর প্রতি একটা ঘৃণা, ব্যঙ্গ, বিদ্বেষ প্রকাশ করছেন; তীব্র ব্যঙ্গোক্তি তিনি তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ করেই প্রকাশ করছেন, যদিও কোথাও তার উল্লেখ নেই। শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর বক্তব্য নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যাচ্ছে। মহিলাটির অনেক গুণ ছিল—চমৎকার সেলাই করতে পারতেন এবং করতেনও। ওয়ার্ডে হয় তো তিনি একমনে সেলাই করছেন, সেই সময়ে একজন ডাক্তারবাবু এসেছেন; অন্যান্য রোগিনীদের সঙ্গে দুটো একটা কথা বলে অন্য কাজ সেরে চলে গেছেন। একটু পরেই দেখা গেল ঐ মহিলা ভীষণ চেঁচামেচি, গোলমাল গালাগালি আরম্ভ করেছেন, তাঁকে আর কিছুতেই থামানো যায় না। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বোঝা যায় নি। পরে বোঝা গেল ডাক্তারবাবু তাঁর সঙ্গে কোনও কথা না বলে চলে গেছেন কেন? এমন কি ঘরে ঢুকে ডাক্তারবাবুকে তাঁর সঙ্গেই আগে কথা বলতে হবে। এই ব্যবহারে তাঁর মনের শিশুসুলভ ঈর্ষা প্রকাশ করছে। দুঃখের বিষয় মহিলাটির লেখার মধ্যে কোথাও তাঁর ভাল হবার প্রেরণার কোনও আভাষ পাওয়া যাচ্ছে না। একই অবস্থায় তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে। স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ নিয়েই থাকতে হচ্ছে—তাঁর সঙ্গে ঘর করতে আর পারেন নি।

দ্বিতীয় রোগিনীর লেখার মধ্যেও ঐ বিশেষ রোগের সব রোগ লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা মেয়ে, গ্রাজুয়েট। তাঁর চিন্তার মধ্যে অনেক ভুল ধারনা, সন্দেহ রয়েছে, অর্থহীন কথা রয়েছে, অসংলগ্নতা রয়েছে, বিভ্রম (Confusion) রয়েছে। কেউ (যাকে উদ্দেশ করে যে-সব কথা বলেছেন) তাঁকে পীড়ন (persecution) করছে এই ধারনায় তীব্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব। অবশ্য দ্বন্দ্ব ভিন্ন কোন রোগই হয় না। এই রোগিনীর মানসিক অবনতি প্রথমোক্ত রোগিনীর চেয়ে কম পরিমাণে ঘটেছে। তদুপরি ভাল লক্ষণ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তাঁর ভাল হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই ভাল হবার প্রেরণা সকলের মধ্যে সমান পরিমাণে থাকে না। এই প্রেরণা স্বাভাবিক মনে ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন মাত্রায় থাকে। এই প্রেরণা না থাকলে ভাল হওয়া অসম্ভব। যার মনে এর তীব্রতা যত সে তত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠে। চিকিৎসার অন্যান্য অঙ্গ সমান রাখলেও ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রগত পার্থক্যের ওপর রোগমুক্তি অনেকখানি নির্ভর করে। এই চরিত্রগত পার্থক্য কিছুটা জন্মগত, কিছুটা অর্জিত। শিশুজীবনের পরিবেশ

ও শিক্ষার ওপর এই চরিত্রগঠন অনেক নির্ভরশীল। সুখের বিষয়, শেষোক্ত রোগিনীটি আরোগ্য লাভ করে চলে গেছেন, এবং ভালই আছেন।

[শ্রীমতী কনক মজুমদার, এম.এস্‌সি.]

মানসিক রোগীর সমস্যা

পুনর্বসতি

১। লুম্বিনি পার্ক হাসপাতালের বহির্বিভাগে একজন রোগী এলেন, সাথে বড় ভাই। বয়স ৩৫, অবিবাহিত, ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন, আর্থিক অবস্থা নিম্ন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর।

গত মহাযুদ্ধে রোগী সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। একদিন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে নিজ পক্ষের কিছু সৈন্যকে গুলি করতে আরম্ভ করেন। কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছিল না। তখন তাঁকে জোর ক'রে ধরে মানসিক অসুস্থতা নিরূপণ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁর দাদা তাঁকে নিয়ে এসে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করান। রোগী ভাল হয়ে গেলেন। কিন্তু চাকুরিটি হারালেন। দাদা প্রায় সর্বস্বান্ত হলেন। রোগী বছর সাতেক ভাল ছিলেন। তারপর কিছুদিন হল আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখনই লুম্বিনি পার্কে চিকিৎসার জন্য আসেন, এবং চিকিৎসায় ভাল হয়ে যান।

মাস তিনেক বাদে একদিন ছেঁড়া জামা ও কাপড় পরে বহির্বিভাগে এসে বসেন; "ডাক্তার বাবু, আবার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, পয়সা কড়ি নেই, কি দিয়ে ওষুধ কিনব? আগে একটা কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি যে বাসাতে থাকতাম এবং ছেলেমেয়ে পড়াতাম, সেখানে বলে দিয়েছে, আর দরকার নেই। দাদা সামান্য বেতনে মফঃস্বলে কাজ করেন, ৬।৭ জন পোষ্য। তাঁকে আর কত কষ্ট দেব। আমার ভাল না হওয়াই উচিত ছিল। বেলেঘাটা থেকে সোজা হেঁটে এসেছি; বাসভাড়া পর্যন্ত দেবার ক্ষমতা নেই। হয় কাজ দিন, নয়ত আবার মাথা খারাপ করে দিন। অন্তত ভাবনা-চিন্তা থেকে মুক্তি পাব। এই বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি কি করব, কথা ফুরিয়ে গেছে চিকিৎসা ফুরিয়ে গেছে। এ সমস্যা চিকিৎসার চেয়েও গুরুতর।

২। দুই নম্বর। রোগিণীর বয়স ১৯, অবিবাহিতা, ভাইবোন ৯।১০টি। বাবা সামান্য কেরাণী। মা সাথে এসেছেন। কি কষ্ট?—না মেয়ে মাঝে মাঝে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে প'ড়ে, বাড়ী থেকে বাইরে চলে যেতে চায়। রাত্রিতে ঘুমোয় না। আত্মহত্যার ইচ্ছা খুব প্রবল। বলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব। সারাদিন একই কথা বলে "আমাকে লেখাপড়া শেখাওনি, দিদির সাথে নার্সিং শিখতে দিলে না। আমার কিছুই হল না, মরা ভাল।" কিছু বলতে গেলে মারতে আসে।

রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি হয়েছে?' সে বলল, "হবে আবার কি? ওষুধ পত্র দেবেন না, খাব না। ওসব পয়সা নেওয়ার ফন্দি। ডাক্তারদের আমি চিনি।" মা মেয়েকে বাড়ী থেকে আনতে গেলে আসতে চাইত না। আবার এখানে এলে বাড়ীতে যেতে চাইত না। জোর জবরদস্তি ক'রে কিছু ইলেকট্রিক্ শক্ দেওয়ার পর ভাল হয়ে গেল। আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়ে বলে দিলাম, "ভাল হয়ে গেছেন, আর আসতে হবে না"।

অফিসে বসে আছি, একদিন সকালবেলা সেই রোগিণী এসে হাজির। বললাম, "কেমন আছেন"?

বলল, "বাড়ীতে থাকতে পারব না, বাবা মা রোজগার

করেন, মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেন। সবাই উপোস ক'রে ক'রে শুকিয়ে গেছে। যা কিছু টাকা মা'র কাছে ছিল, সব আমার চিকিৎসাতে খরচ হয়ে গেছে। এ কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না। একটা যে কোনও, যত ছোট কাজই হোক, তার ব্যবস্থা করে দিন।"

বললাম "কি কাজ করবেন? ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন, কোনও রকমে স্কুল ফাইনালটা পাশ করতে পারলে, একটা কিছু হতে পারে।" বলল— "পয়সা কোথায়, খেতে পাচ্ছি না।" একদিন ওর মাকে বললাম "ভাল হয়ে গেছে; মেয়ের পড়াশোনার একটা ব্যবস্থা করুন, নয়ত সারাজীবন খাবে কি করে"। তিনি কেঁদে ফেলে বললেন, "নিজেরাই খেতে পাচ্ছিনা। দয়া ক'রে ওকে আপনি একটা কাজ দিন।" পরে জানলাম, অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পূর্ব অসুস্থতার জন্য কেউ চাকরি দিতে রাজি হন নি।

আমি ছুটি মাত্র উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এই দুর্ভাগাদের সংখ্যা এত বেশী যে জনসাধারণ তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

এদের পুনর্বসতির উপায় কি? এ সমস্যা আজ আমাদের জাতীয় সমস্যা। কারণ যে কোনও ঘরেই এ-সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আমি এ সমস্যা সমাধানের জন্য জনসাধারণ ও সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সমাজকল্যাণকামী জনসাধারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজ্যসরকার এদের দিকে না তাকালে এদের দেখবে কে? এরাও আর দশজনের মত হয়ে বাঁচতে চায়। সমাজ কি সে সুযোগ আমাদের দেবে না। (ক্রমশঃ)

মিলনমোহন মজুমদার
এম.বি.বি.এস্
আবাসিক চিকিৎসক, লুম্বিনী পার্ক

A Primer of Freudian Psychology : Calvin S. Hall. George Allen & Union. 13s. 6d. net.

বইখানি ইংরেজী ভাষায় লেখা ফ্রয়ডীয় মনোবিস্তার এক মনোজ্ঞ আলোচনা। ইংরেজীতে লেখা ফ্রয়েডের উপর বহু বই আছে। কিন্তু তবু এখানি কেবল বহুর আয়তন বৃদ্ধি নয়। বইখানির একটি স্বকীয়তা আছে। ফ্রয়েডের মনোবিদ্যা বা মনঃসমীক্ষণ বলতে সাধারণতঃ আমরা পাগল, আধপাগল, হাবাগোবা, যৌন-অপরাধী ও বৈকৃতকামের মন নিয়েই কারবার ক'লে ভেবে থাকি। কিন্তু বইখানিতে দেখানো হয়েছে যে বিভিন্ন জাতীয় অসুস্থ মন ছাড়া সুস্থ মন সম্বন্ধেও ফ্রয়েডের কিছু বলবার আছে এবং তা একটা বিশেষ কিছুই। ফ্রয়েডের মতে সুস্থ ও অসুস্থ মনের কোনও উপাদানগত পার্থক্য নেই। সাধারণ যে উপাদানগুলি দিয়ে কৃতকর্মা সংসারী বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মন তৈরী সে উপাদান দিয়েই একজন খুনে বা লম্পটের মনও তৈরী। তবে পার্থক্য এসে পড়ে উপাদানগুলির সুসঙ্গতি ও সুবিন্যাসের বেলায়। কাজেই সুস্থ ও অসুস্থ যে কোনও মনকে বুঝতে গেলে তার উপাদানগুলি যেমন চেনা দরকার—তাদের সঙ্গতি ও বিন্যাসের মারপ্যাঁচও জানা দরকার। এই বইটিতে সুস্থ ব্যক্তিত্বের উপাদান, গঠন ও বৃদ্ধি নিয়েই সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে সুস্থতার সীমারেখা ডিঙিয়ে অসুস্থতায় হাজির হওয়া যায় কি ক'রে। ফ্রয়েড যে কেবল মনোচিকিৎসক নন, তিনি যে মনোবিৎও, লেখক এই কথার উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। বইখানি পড়তে গিয়ে পাঠককেও এই বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

ব্যক্তিত্ব (Personality) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বইটিকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ বাদে আর চারটি পরিচ্ছেদই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম পরিচ্ছেদটি ফ্রয়েডের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা। লেখক প্রশ্ন করেছেন : What was Freud ? ফ্রয়েডের বিস্তৃত জীবনের বহুবিচিত্র কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা ক'রে অতি সার্থকভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন : "Physician, Psychiatrist, Psycho-Analyst, Psychologist, philosopher and critic—these were his several vocations. Yet, taken separately or together, they do not really convey Freud's importance to the world. Although the word genius is used indiscriminately to deseribe a number of people there is no other single word that fits Freud as well as this word does. He was a genius" (Page 14). নাতিদীর্ঘ জীবন আলোচনাটুকু বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদগুলি —যেখানে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন শিরোনামায় অভিহিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি "The Organisation of Personality" নামে অভিহিত। এখানে মনোরাজ্যের তিন বিভাগ—Id, Ego ও Superego সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রকৃতি ও কার্যের দিক থেকে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ "The Dynamics of Personality" নামে অভিহিত। এখানে ব্যক্তিত্বকে শক্তিকেন্দ্ররূপে দেখানো হয়েছে। এই শক্তির আধার হচ্ছে Id। ইদের (Id) মধ্যে শক্তিগুলিরূপে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ (Instincts)। ইদের অবাধ ও অন্ধশক্তিকে সংহত করে কেমনভাবে Ego ও Superego ব্যক্তিত্বের অংশ-রূপে আবির্ভূত হচ্ছে তা নিখুঁতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তাছাড়া উদ্বেগ-এর (Anxiety) স্বরূপ কি

এবং উদ্বেগ সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনে কি অংশ গ্রহণ করে থাকে তারও আলোচনা পাওয়া যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদ "The Development of Personality" নামে অভিহিত। শৈশব থেকে আরম্ভ করে জীবনের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ব্যক্তিত্ব কেমনভাবে বিকশিত ও বিবর্ধিত হয়ে ওঠে—তার বিকাশে কোন কোন মানসপ্রক্রিয়া কাজ করতে থাকে তার আলোচনা এখানে করা হয়েছে। যে মানসপ্রক্রিয়াগুলি এ ব্যাপারে সহায়তা ক'রে থাকে অথবা ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে—যেমন Identification Sublimation, Displacement, Projection; Fixation, Regression, Defense Mechanism ইত্যাদি—এদের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আরও আলোচনা রয়েছে যৌন-প্রবৃত্তির (Sexual instinct) স্বরূপ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে। এ সব বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বিষয় গুলিকে সহজবোধ্য করবার জন্যে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই লেখক অতি সহজ উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। এতে আলোচনাগুলি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। পঞ্চম এবং শেষ পরিচ্ছেদ "The Stabilized Personality" নামে অভিহিত। প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলতে তিনি আদর্শব্যক্তিত্ব বা সুসম্পূর্ণ ও সুসংগঠিত ব্যক্তিত্ব মনে করেন না। আবার প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এমনও নয় যে সেখানে অভাববোধ, নৈরাশ্য, উদ্বেগ বা অস্বস্তি থাকবে না। জীবন কখনই সম্পূর্ণ উদ্বেগ-উত্তেজনামুক্ত হতে পারে না। তবে প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অর্থ কি ? লেখক এই পরিচ্ছেদে প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রচলিত ধারণা নাকচ ক'রে তার প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করেছেন এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা স্থাপন ব্যাপারে যে মানসপ্রক্রিয়াগুলি কাজ করে তাদের আলোচনা করেছেন।

বইটির অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে নির্দেশপঞ্জী (References) সংযোজনা। পরিচ্ছেদগুলির অন্তে এই নির্দেশপঞ্জী সংযুক্ত হয়েছে। প্রতি পরিচ্ছেদে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ফ্রয়েডের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ ও আলোচনাদি নির্দেশপঞ্জীতে স্থান পেয়েছে। উৎসাহী পাঠকের আগ্রহ মেটাতে এগুলি বিশেষ সাহায্য করবে।

ফ্রয়ডীয় মনোবিজ্ঞান বিশেষ জটিল ব্যাপার। কিন্তু লেখক সেই জটিল ব্যাপারকে সহজবোধ্য ক'রে তোলার বিশেষ চেষ্টা করেছেন। লেখার ভাষা অতি সরল, লেখনভঙ্গী স্বচ্ছন্দ ও মনোরম। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। সাধারণ পাঠক পাঠিকা বইটি পড়ে ফ্রয়ডীয় মনোবিজ্ঞান উপলব্ধির তৃপ্তি পাবেন।

—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

Play Group Therapy

Hain G. Ginott

(International Journal of Group Psychotherapy Vol. VIII, No. 4, Oct. 1958)

আমাদের যে ধারণা ছিল সংঘ-চিকিৎসা তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সংঘ-চিকিৎসার অবদান প্রধানতঃ দুইটি. যথা—

(১) বৈজ্ঞানিক তথ্যানুযায়ী প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা ফলপ্রদ।

(২) সর্বতোভাবে আয়ত্বাধীন, সুলভ।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই সংঘ ক্রীড়া চিকিৎসা তিনটি উপায়ে উপকার করিতে পারে, যথা :—

(ক) স্বাস্থ্যপ্রদ সম্পর্ক গড়িয়া তুলে।

(খ) গুটেষা মোচনে সহায়তা করে।
(Complex)

(গ) পরিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।
(Insight)

(ঘ) বাস্তববোধ জাগ্রত হয়।
ইহা আমাদের উদ্গতিরও সহায়ক।
(Sublimation)

(২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম অবস্থাতেই লুম্বিনি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। সুচনা হইতেই বহু বাধার অতিক্রম করিতে হইয়াছে। হাসপাতালের কাজ আরম্ভ হওয়ার পরেই যুদ্ধের ফলে নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগিল। কলিকাতায় বোমা পড়িল। সহর ছাড়িয়া লোক বাহিরে ছুটিল, সে হিড়িকেও হাসপাতাল নির্দিষ্টভাবে কাজ করিয়া গেল। সব জিনিষেরই দাম বাড়িল তবু কর্মীদের সামান্য বেতনও বৃদ্ধি করা সম্ভব হইল না। ক্রমে দুর্ভিক্ষ, রেশনের সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি বহু রকমের ঝড়ঝাপটা সামলাইয়া লুম্বিনি কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচিয়াই রহিল না, ক্রমে বড়ও হইতে লাগিল। একদিকে নানা দ্রুতন রকমের সমস্যায় পড়িয়া দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অন্যদিকে কিছু কিছু করিয়া লোকে মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধেও সজাগ হইতে লাগিল। তখনও ক্ষুদ্র হাসপাতাল হইলেও এই মনোভাবের পরিবর্তনের মূলে লুম্বিনির অবদান সামান্য নহে।

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি বেদিয়াডাঙ্গা রোডেই একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ী ভাড়া নিয়া পুরুষ বিভাগটি সে বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। বেড সংখ্যা বাড়াইবার দাবি যত বাড়িতে লাগিল নানা চেষ্টায় ধীরে ধীরে নতুন ঘর তৈরী করিয়া বেড ক্রমে বাড়ান হইল। ১৯৫০ সাল হইতে আরবান ইঞ্জিনীয়ারস্ হাসপাতালের গৃহনির্মাণের কাজে অগ্রণী হন। তাঁহাদের সহিতও ঐ একই সর্ত, যখন যেমন সম্ভব টাকা ক্রমে ক্রমে দেওয়া হইবে। আজও তাঁহারা সেই নিয়মেই কাজ করিয়া যাইতেছেন। গত বৎসর, পূর্বে তাঁহাদিগকে দেওয়া বাদে মোট ১২৮৮৭৲ টাকা প্রাপ্যার মধ্যে ৮০০০৲ টাকা তাঁহারা হাসপাতালকে দান করেন।

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি প্রথম হইতেই জনসাধারণের যে সহানুভূতির উপর আস্থা রাখিয়া এই লোকহিতকর কাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন তাহাদের সে আস্থা আজ বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

লুম্বিনির প্রধান কথা হইল, মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসা যথাসাধ্য কম ব্যয়ে করা। এই হাসপাতাল কোনও মুনাফা রাখিতে পারে না। যাহা আমদানি হয় সব টাকা এই হাসপাতাল বা এতদ্‌সংযুক্ত- সম শ্রেণীর কোনও লোকহিতকর কাজেই ব্যয় করা হয়। কেহ ঐ অর্থ হইতে লাভের অংশ হিসাবে নিতে পারেন না। জনসাধারণ লুম্বিনির বিষয় ক্রমে যত জানিতে পারিতেছেন ততই অধিক সংখ্যক বেড এবং আরও কম ব্যয়ের বেড রাখিবার দাবি বাড়িতেছে। সাধারণের অর্থকষ্ট দেশে বাড়িতেছে। নানা সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যাও বাড়িতেছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে হাসপাতালে রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আজও করা সম্ভব হয় নাই। অর্থাভাবই ইহার প্রধান ও একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে।

লুম্বিনির খ্যাতি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাসপাতাল বাড়াইবার জন্য নতুন বাড়ী তৈরীর খরচের কিছু অংশ হিসাবে ২৪০০০৲ টাকা দেন। তাহার পরে ১৯৫৬ সালে ৫০০০৲, ১৯৫৭ সালে ১০০০০৲, ১৯৫৮ সালে ১০০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯৫৫ সাল হইতে লুম্বিনিতে ১০টি ফ্রী বেড ও ১০টি কম ব্যয়ের বেড রাখিবার ব্যয় হিসাবে প: ব: সরকার বৎসর ২৪,০০০৲ করিয়া দিয়া আসিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

—তরুণচন্দ্র সিংহ